অতীত ও ঐতিহ্য

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : অক্টোবর, ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবন্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, econnomic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত সপ্তমশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'অতীত ও ঐতিহ্য' প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য 'অতীত ও ঐতিহ্য' বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯— এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'পরিবেশ ও ইতিহাস' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্রও প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী অতীত এবং ঐতিহ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা সারণির ব্যবহারও করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'পরিবেশ ও ইতিহাস' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

জুলাই, ২০১৪
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম 'অতীত ও ঐতিহ্য'। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের বইটি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক কয়েকটি ধারণাকেও একটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পচ্ছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ম্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী-- 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো। সেগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে এবং স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরণের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

জুলাই, ২০১৪
বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

উত্তরা চক্রবর্তী
সৈয়দ আবিদ আলী
প্রবাল বাগচী
সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়
তিস্তা দাস
সোমদত্তা চক্রবর্তী
কাশ্‌শফ গনি
অনির্বাণ মণ্ডল
প্রত্যয় নাথ
পরমা মাইতি

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ সহায়তা : কৌশিক সাহা, প্রদীপকুমার বসাক
সুগত মিত্র, বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইতিহাসের ধারণা	১
২.	ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	৭
৩.	ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	২৫
৪.	দিল্লি সুলতানি : তুর্কো-আফগান শাসন	৪৩
৫.	মুঘল সাম্রাজ্য	৬৯
৬.	নগর, বণিক ও বাণিজ্য	৯১
৭.	জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি : সুলতানি ও মুঘল যুগ	১১৩
৮.	মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	১৫৯
৯.	আজকের ভারত : সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন	১৬৭
	শিখন পরামর্শ	১৭৩

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের ধারণা

১.১ ইতিহাসের গল্প-সল্প

যত পুরোনো দিনের কথাই হোক, গল্পের মতো করে বললে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু মুশকিল হলো অনেক ইতিহাস বইতেই গল্পগুলি ভালো জমে না। খালি রাজা-উজিরের নাম-ধাম, যুদ্ধের সাল-তারিখ। তাই ইতিহাস পড়তে গিয়ে গল্পের মতো সেই মজাটা সবাই পায় না। গুলিয়ে যায় নামগুলি। মনে থাকে না সাল-তারিখ। কে কার পরে ক্ষমতায় এলেন—সেসব মনে রাখা খুবই কঠিন!

কিন্তু কঠিন হলেও একটু আধটু নাম বা সাল মনে রাখা জরুরি। কারণ, যে সব ঘটনার কথা ইতিহাস বইতে থাকে, সেগুলি আজ থেকে অনেক-অনেক বছর আগে ঘটেছিল। আবার সব ঘটনাগুলি একই দিনে বা একই বছরে ঘটেনি। তাহলে কীভাবে জানা যাবে কোন ঘটনাটা কবে ঘটেছিল? তাই আগে-পরে করেই সাজাতে হয় ইতিহাসকে। তার জন্য জানতে হবে ঘটনাগুলির সময়কাল। ইতিহাসে সময় মাপতে গেলে চাই তারিখ, মাস, সাল, শতাব্দী, সহস্রাব্দ—এইসব নানা সময় মাপার হিসাব। সেখানে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার হিসাব বিশেষ কাজেই লাগে না! তাই সাল-তারিখগুলি যতই জটিল হোক, আসলে ওরা নির্দোষ। পাছে আমরা সময়ের হিসাবে গোলমাল করে ফেলি, তাইতো ওরা আমাদের সাবধান করে দেয়। ফলে ইতিহাস বইতে একটু-আধটু সাল-তারিখ থাকবেই। নানান ধাঁধা বা মজার হিসাব করে সাল-তারিখ মনে রাখাটা একটা খেলা। দেখোতো, কত ভালো করে তোমরা এই খেলাটা খেলতে পারো বছর জুড়ে।

জটিল নাম-ধামগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা তবু থেকেই গেলো। কারো যদি নামের আগে 'গঙ্গাইকোণ্ডচোল' বা 'সকলোত্তরপথনাথ'-এর মতো উপাধি বসে! কারো যদি নাম হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি! এসব নাম বা উপাধি মনে রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু এই উপাধি বা নামগুলি অনেক কাল আগের মানুষদের। তাঁরাও হয়তো এতো বড়ো বড়ো নাম-উপাধি নিয়ে গোলমালে পড়তেন। কিন্তু উপায় ছিল না। ঐ সময় এমন বড়ো খটোমটো উপাধি এবং নামেরই চলন ছিল। সেই নামগুলি এখন আর বদলে নেওয়ার উপায় নেই। বাবর, আকবর প্রভৃতি নামগুলি বেশ ছোটো, সহজেই মনে থাকে।

"বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে"— এই বাক্যটায় ছ-জন মুঘল সম্রাটের নামের হদিশ লুকিয়ে আছে। দেখোতো নামগুলি খুঁজে পাও কিনা? সূত্র লুকিয়ে আছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

কিন্তু যতোই শক্ত লাগুক, দন্তিদুর্গ নামের কাউকে-তো আর ছোটো করে দন্তি বা দুর্গ বলে লেখা যায় না!

কিন্তু ধরা যাক তোমাদের কারো কারো বেশ মনে থাকে সব নাম বা সাল। ইতিহাস বুঝতে পারা কি তাকেই বলে? সোজা কথায় এর উত্তর হলো— না। সাল-তারিখ নাম-ধাম মুখস্থ থাকলেই ইতিহাস জানা হয় না। তাহলে ইতিহাস জানা কাকে বলে? ছোটো করে বললে বলা যায়, বছরের পর বছর ঘটা নানান ঘটনার এবং অনেক লোকের অনেক কাজকর্মের কারণ এবং ফলাফল বোঝার চেষ্টা করাই ইতিহাস জানা। এমন অনেক ঘটনা এবং কাজ আগে ঘটেছে, যার ছাপ আজও আমাদের চারপাশে রয়েছে। তাই সেই সব কাজ এবং ঘটনাগুলো বিষয়ে আমাদের ধারণা থাকা দরকার। সেই ধারণা তৈরির জন্যই ইতিহাস পড়ার দরকার হয়।

টুকরো কথা

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাসের সব উপাদান একরকম নয়। একটি পুরোনো মূর্তি, পুরোনো মুদ্রা বা পুরোনো বই এক জিনিস নয়। তাই ইতিহাসের উপাদানগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— লেখ, মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও লিখিত উপাদান। পাথর বা ধাতুর পাতে লেখা থেকে পুরোনো দিনের অনেক কথা জানা যায়। সেগুলিকে বলে লেখ। তামার পাতে লেখা হলে তা হয় তাম্রলেখ। আবার পাথরের উপর লেখা হলে তা হয় শিলালেখ। আর কাগজে লেখাগুলিকে বলা হয় লিখিত উপাদান।

১.২ ইতিহাস জানার রকমফের

পুরোনো দিনের যেসব জিনিস আজও রয়ে গেছে সেগুলোই অতীতের কথা জানতে সাহায্য করে। পুরোনো ঘর-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ, মূর্তি, টাকা-পয়সা, আঁকা ছবি, বইপত্র থেকে এক একটা সময়ের মানুষের বিষয়ে আমরা জানতে পারি। তাই সেগুলি ইতিহাসের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতির কোপে আর মানুষের হাতে পড়ে সেসব উপাদানের অনেক কিছুই আজ আর নেই। তাই একটানা ইতিহাস জানার উপায়ও নেই। ভাঙাচোরা, ছিঁড়ে যাওয়া উপাদানের টুকরো খুঁজে জুড়ে নেন ঐতিহাসিক। তারপর সেগুলিকে সাজিয়ে নেন আগে পরে করে। তার থেকে তৈরি করেন অনেক আগের সেই সময়ের একটা ছবি। আর যেখানে উপাদানের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

টুকরো উপাদান দিয়ে ইতিহাসের ফাঁক ভরাট করার সময় ঐতিহাসিককে সাবধান থাকতে হয়। খেয়াল রাখতে হয় যাতে ঠিক টুকরো ঠিক সময়ে খাপ খায়। সময় আর জায়গা আলাদা হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায় কথার মানে। সেটা ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হয়। আজকাল তোমরা 'বিদেশি' বলতে ভারতের বাইরে অন্য দেশের লোকেদের বোঝো। কিন্তু সুলতানি বা মুঘল যুগে 'বিদেশি' বলতে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে কোনো লোককেই বোঝাতো। তাই শহর থেকে অচেনা কেউ গ্রামে গেলে তাকেও ঐ গ্রামবাসীরা 'পরদেশি' বা 'অজনবি' ভাবতেন। ফলে মুঘল যুগের কোনো লেখায় 'পরদেশি' কথাটা দিয়ে সবসময় ভারতের বাইরে থেকে আসা লোক বোঝাতো না, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আবার ধরো, 'দেশ' বলতে অনেকেই

তাঁদের আদি বাড়ি বোঝেন। যেমন, কেউ হয়তো বলেন— তাঁর দেশ বর্ধমান। এখানে 'দেশ' আসলে একই রাজ্যের মধ্যে আলাদা অঞ্চলকে বোঝাচ্ছে। কারণ বর্ধমান জায়গাটি ভারত বা পাকিস্তানের মতো দেশ নয়। সেটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা মাত্র। তাহলে দেখো সুলতানি বা মুঘল আমলে কিংবা আজকের দিনেও 'দেশ' কথাটার কতো রকম ব্যবহার হয়। যখনই ইতিহাস পড়বে তখন আগে বুঝে নেবে কোন সময়ে কোন অঞ্চলের কথা সেখানে বলা হচ্ছে।

এই বইতে প্রায় হাজার বছরের ভারতের ইতিহাস তোমরা জানবে। মোটামুটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে সপ্তদশ শতক পেরিয়ে অষ্টাদশ শতকের দোরগোড়া পর্যন্ত এই হাজার বছরে ভারতবর্ষে অনেক কিছু বদল ঘটেছে। আবার কিছু কিছু বিষয়ে মিল রয়ে গেছে। তবে কোনো বদলই রাতারাতি ঘটেনি। এখানে সেই ধারাবাহিক বদলগুলির নানা কথাই বলা হয়েছে।

টুকরো কথা

হিন্দ, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া

*খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস 'ইন্ডিয়া' নামটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনি অবশ্য এদেশে আসেননি। তিনি পারসিক লেখাপত্র থেকে ভারত সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ এলাকা কিছুদিনের জন্য পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখন এই অঞ্চলের নাম হয় 'হিদুষ'। ইরানি ভাষায় 'স'-এর উচ্চারণ নেই। তাই 'স' বদলে গিয়ে হয়েছিল 'হ'। ফলে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলগুলি হিদুষ নামে পরিচিত হলো। আবার গ্রিক ভাষায় 'হ' এর উচ্চারণ নেই। তার বিকল্প 'ই'। অতএব যা ছিল সিন্ধু-হিদুষ, তা গ্রিক বিবরণে অনেকটা বদলে গিয়ে 'ইন্ডিয়া' হলো। তবে খেয়াল রেখো, সেইসময় ইন্ডিয়া শব্দটি সিন্ধু ব-দ্বীপ এলাকাকেই মূলত বোঝাত। পরবর্তী সময়ে গ্রিকদের বিবরণী পড়লে বোঝা যায় পরবর্তীকালে ইন্ডিয়া বলতে উপমহাদেশকেই বোঝানো হয়েছে। উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র —এই প্রধান দুই সীমানা সম্পর্কে গ্রিক লেখকরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিদেশি তথ্যসূত্রে আরেকটি নাম পাওয়া যায়— 'হিন্দুস্তান'। আরবি-ফারসি ভাষায় হিন্দুস্তানের কথা বারবার এসেছে। ২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানীয় শাসকের একটি শিলালেখতে হিন্দুস্তান শব্দটি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও সিন্ধু নদী সংলগ্ন অঞ্চলকেই হিন্দুস্তান হিসাবে বোঝানো হয়েছে। দশম শতকের শেষভাগে অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত **হুদুদ অল্ আলম** গ্রন্থে 'হিন্দুস্তান' শব্দ দ্বারা সমগ্র ভারতকে বোঝানো হয়েছে।*

১.৩ ইতিহাসের গুণ-ভাগ

একটি দিনকে আমরা ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেন্ড দিয়ে ভাগ করতে পারি। কিন্তু হাজার হাজার বছরকে ভাগ করার উপায় কী? ঐতিহাসিকরা তাই 'যুগ' দিয়ে আলাদা করেন লম্বা সময়কালকে। সাধারণভাবে 'প্রাচীন', 'মধ্য' ও 'আধুনিক'— এই তিন যুগে ইতিহাসের সময়কে ভাগ করা হয়। সেই অর্থে যে হাজার বছরের কথা এখানে আলোচনা করা হবে, সেটা মধ্যযুগে পড়ে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এভাবে যুগের পাঁচিল তুলে ইতিহাসকে ভাগ করা যায় না। হঠাৎ করে কোনো এক দিন সকাল থেকে একটি যুগ শেষ হয়ে আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায় না।

তাহলে কীভাবে বোঝা যায় কোন সময়টি কোন যুগে পড়বে? আসলে মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দেশশাসন, যুদ্ধ, পড়াশোনা— এসব কাজের এক একটি বিশেষ দিক এক এক সময়ে দেখা যায়। সেগুলির তফাৎ থেকেই যুগ ভাগ করা রেওয়াজ আছে। তাহলে কেমন ছিল মধ্যযুগের ভারত? আগে অনেকে বলতেন, সেসময়ে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল মানুষের জীবন। কোনো কিছুতেই নাকি কোনো উন্নতি হয়নি। তবে আজকাল আর সেকথা মানা হয় না। টুকরো টুকরো উপাদান জুড়ে ঐতিহাসিকরা সেসময়ের ইতিহাস লিখেছেন। তাতে দেখা যায়, তখন জীবনের নানান দিকে অনেক কিছুরই উন্নতি করেছিল ভারতের মানুষ। এই বইতে সেসব উন্নতির কথাও তোমরা জানতে পারবে।

এক দিকে ছিল নানান নতুন যন্ত্র ও কৌশলের ব্যবহার। কুয়ো থেকে জল তোলা, তাঁত বোনা বা যুদ্ধের অস্ত্র— বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছিল অনেক কিছুই। অনেক নতুন খাবার ও পানীয়ের কথা এই সময় জানতে পারে ভারতের লোক। এর সবচেয়ে মজার উদাহরণ হলো রান্নায় আলুর ব্যবহার। পোর্তুগিজদের হাত ধরে এদেশে আলু খাওয়ার চল শুরু হয়।

দেশ শাসনে আর রাজনীতিতেও নতুন অনেক দিক দেখা গিয়েছিল। শুধু রাজ্য বিস্তার নয়, জনগণের ভালো-মন্দের কথাও শাসকদের ভাবতে হয়েছিল। কখনও রাজার শাসন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আবার কখনও সব ক্ষমতা একজন শাসকই হাতে তুলে নিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে একদিকে ছিল কৃষি, অন্যদিকে ব্যাবসা-বাণিজ্য। তৈরি হয়েছিল নতুন নতুন শহর। বন কেটে চাষবাস করার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

ধর্মভাবনায় বেশ কিছু নতুন পথের হদিশ সেসময়ের মানুষ পেয়েছিল। আচার-অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর নয়, ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়ার কথা বলা

টুকরো কথা

আদি-মধ্যযুগ

রাতারাতি ইতিহাসের যুগ বদলে যায় না। ধরো দুপুরবেলার কথা। সেটা না সকাল না বিকেল। তেমনই ভারতের ইতিহাসে একটা বড়ো সময় ছিলো, যখন প্রাচীন যুগ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে আর মধ্যযুগও পুরোপুরি শুরু হয়নি। ঐতিহাসিকরা সেই সময়টিকে বলেন আদি- মধ্যযুগ।

হয়েছিল। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাই হয়ে উঠেছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যম। তার ফলে ভারতের নানান অঞ্চলে আঞ্চলিক অনেক ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ হয়। পাশাপাশি ছিল নানা ধরনের শিল্পচর্চা।

কিন্তু শিল্প হোক বা সাহিত্য— সবেতেই সাধারণ গরিব মানুষের কথা খুব বেশি ছিল না। সেসবের বেশির ভাগই ছিল শাসকের গুণগানে ভরা। সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকতো শাসকের নাম। তাই বলা হয়— চোল রাজারা মন্দির বানিয়েছেন। অথবা তাজমহল বানিয়েছেন সম্রাট শাহজাহান। অসংখ্য সাধারণ কারিগর এবং শিল্পী যারা মন্দিরগুলি এবং তাজমহল বানালেন, তাঁদের বেশির ভাগের নাম আমরা জানি না।

১.৪ ইতিহাসের গোয়েন্দা

ইতিহাস বই পড়তে সবসময় ভালো না লাগলেও, গোয়েন্দা গল্প পড়তে তোমাদের নিশ্চয় ভালো লাগে। আসলে ঐতিহাসিকও একজন গোয়েন্দা। গল্পের গোয়েন্দা টুকরো টুকরো সূত্র (Clue/ক্লু) খুঁজে বের করেন। তারপর যুক্তি দিয়ে সূত্রগুলির ঠিক-ভুল বিচার করেন। শেষে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা তুলে ধরেন। তেমনি ঐতিহাসিকও টুকরো টুকরো সূত্র খোঁজেন। সেগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন। তারপরে সূত্রগুলি সাজিয়ে অনেককাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা সময়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আর যেখানে সূত্রের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

গোটা বছর জুড়ে এই বইটি পড়ার সময়ে তোমরাও এক এক জন ঐতিহাসিক বা গোয়েন্দা হয়ে ওঠো। খুঁটিয়ে দেখো সূত্রগুলি। অনেক জায়গায় ফাঁক আছে। চেষ্টা করো যুক্তি দিয়ে সেগুলির ভরাট করার। খুঁজে দেখো নতুন কোনো সূত্র পাও কি না। তাহলে দেখবে ইতিহাস পড়তে গিয়ে তোমরা এক একজন ইতিহাসের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছো। তখন ইতিহাস পড়তে আরো ভালো লাগবে।

ভেবে বলোতো ইতিহাসে অনেক সময়েই কেন সাধারণ মানুষ বা কারিগর ও শিল্পীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না?

তোমার পাতা

ইতিহাসের গোয়েন্দা হিসাবে হাত পাকানোর জন্য সামনের আটটি অধ্যায় রইল। ঐ আটটি অধ্যায়ে যা যা সূত্র পাবে সেসব এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর জুড়ে ....

দ্বিতীয় অধ্যায় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

আমরা ভারতের অধিবাসী। ভারতের যে অংশে আমরা থাকি তার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এই নামটি বেশি দিনের পুরোনো নয়। এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব এই জায়গাটি অনেক কাল আগে কী নামে পরিচিত ছিল, এর ভৌগোলিক সীমানা কী ছিল, এর বিভাগগুলি কী ছিল, কারা এখানে শাসন করতেন, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ইত্যাদি। এর জন্য আমরা ফিরে যাব অনেক কাল আগের কথায়। সে সময় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন আজকের তুলনায় অনেক আলাদা ছিল।

২.১ প্রাচীন বাংলা

প্রথমে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম্বন্ধে জানব। এখানে মনে রাখতে হবে যে এসব হলো এক-দেড় হাজার বছরেরও বেশি আগেকার কথা। এই ভৌগোলিক বিভাগগুলির সীমানা সব সময় এক থাকেনি। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা নানান সময়ে আলাদা-আলাদা ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

টুকরো কথা

বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ। প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ বলতে যে অঞ্চলটিকে বোঝানো হতো তা ভৌগোলিকভাবে খুব বড়ো কোনো এলাকা ছিল না। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির মধ্যে বঙ্গ ছিল একটি বিভাগ মাত্র। মহাভারতে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদিকে একেকটি আলাদা রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যেও বঙ্গ ও সুহ্ম নামদুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

*খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক মিনহাজ ই-সিরাজের লেখাতেও বঙ্গ রাজ্যের কথা আছে। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি গ্রন্থে এই অঞ্চলকে **সুবা বাংলা** বলে উল্লেখ করেছেন। সুবা মানে প্রদেশ বা রাজ্য।*

*ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকরা এখানে এসেছিলেন। তাঁরা এই দেশের নাম দিয়েছিলেন **বেঙ্গালা**। স্বাধীনতার আগে এই বিরাট ভূখণ্ড **বাংলা** বা **বাংলাদেশ** বা **বেঙ্গল** নামেই পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের সময় বাংলার পশ্চিম ভাগের নাম হলো **পশ্চিমবঙ্গ**। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য। ঐ সময় পূর্ব বাংলা চলে গেল নতুন দেশ পাকিস্তানে। পরে তার নাম হলো **পূর্ব পাকিস্তান**। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হলো। তার নতুন নাম হলো **বাংলাদেশ**।*

এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র নাও। এখন পশ্চিমবঙ্গে ক-টি জেলা? কোন জেলায় তোমার বাড়ি? সেই জেলাটি ২.১ মানচিত্রের কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

প্রাচীন বাংলার সীমানা প্রধানত তিনটি নদী দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই নদীগুলি হলো ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা (***২.১ মানচিত্র দেখো***)। বাংলার একেকটি অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন ছিল। আবার, কয়েকটি অঞ্চল অন্য কোনো অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। যখন কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা রাজ্যবিস্তার করতেন তখন সেই অঞ্চলের সীমানাও বদলে যেত।

প্রাচীন বাংলার প্রধান অঞ্চলগুলি ছিল পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, সমতট ও হরিকেল। সাধারণভাবে কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের নাম অনুসারে জায়গার নাম হতো। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ইত্যাদি নামগুলি এক একটি জনগোষ্ঠীর নাম। তারা যে অঞ্চলে থাকত, সেই অঞ্চলটির নাম হতো তাদের নাম অনুযায়ী।

পুণ্ড্রবর্ধন : পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহি এবং পাবনা জুড়ে ছিল। এক সময় শ্রীহট্টও (সিলেট) এর ভিতরে ছিল। গুপ্ত যুগে পুণ্ড্রবর্ধন ছিল একটি *ভুক্তি* বা শাসন-এলাকা।

বরেন্দ্র : ভাগীরথী ও করতোয়া নদীর মধ্যের এলাকা বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ : প্রাচীন কালে পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মাঝে ত্রিভুজের মতো দেখতে ব-দ্বীপ এলাকাকে বঙ্গ বলা হতো। সম্ভবত ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের এলাকাও এর মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে রাঢ় এবং সুহ্ম নামে দুটো আলাদা অঞ্চলের উৎপত্তি ঘটলে বঙ্গের সীমানাও বদলে যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে বঙ্গ বলতে এখনকার বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুর, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলকে বোঝানো হতো।

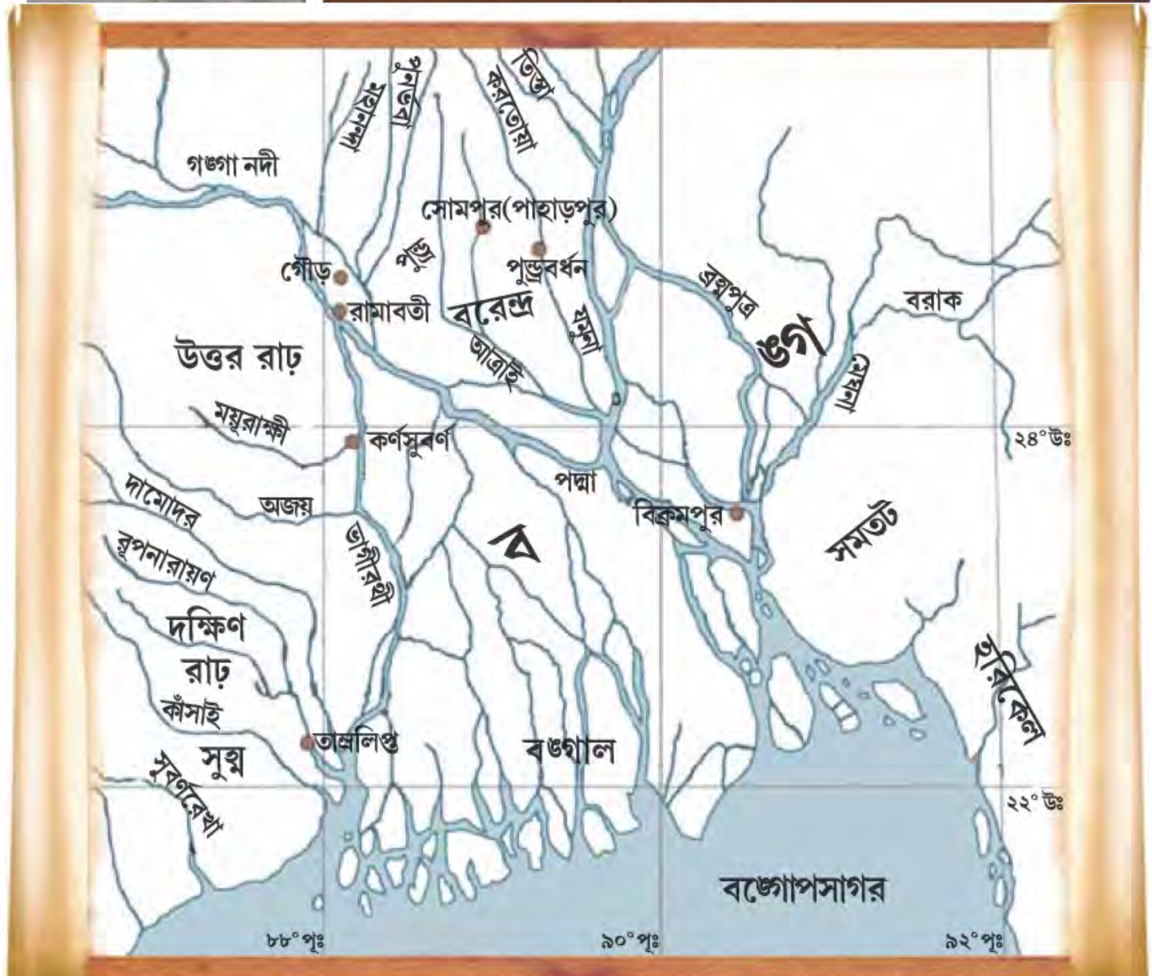

মানচিত্র ২.১ : আদি-মধ্য যুগে বাংলা (আনুমানিক ৬০০-১২০০খ্রিঃ)

বঙ্গাল : বঙ্গাল অঞ্চল বলতে বঙ্গের দক্ষিণ সীমানাবর্তী বঙ্গোপসাগরের উপকূলকে চিহ্নিত করা হতো।

রাঢ়-সুহ্ম : প্রাচীন রাঢ় বা লাঢ় অঞ্চলের দুটি ভাগ ছিল। উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ়। জৈনদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে উত্তর রাঢ় ছিল বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) এবং দক্ষিণ রাঢ় ছিল সুব্ভভূমি (সুহ্মভূমি) এলাকা। উত্তর এবং দক্ষিণ রাঢ়ের মাঝের সীমানা ছিল অজয় নদ। আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম ভাগ, বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনার একাংশ এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তর ভাগ ছিল উত্তর রাঢ় অঞ্চল। দক্ষিণ রাঢ় বলতে আজকের হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমান জেলার বাকি অংশ এবং অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বিরাট এলাকাকে বোঝানো হতো। দক্ষিণ রাঢ় ছিল বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এলাকা। মহাভারতের গল্পে এবং কালিদাসের কাব্যে আছে যে ভাগীরথী এবং কাঁসাই (কংসাবতী) নদীর মাঝে সমুদ্র পর্যন্ত বিরাট এলাকা এর অন্তর্গত ছিল।

গৌড় : প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলায় গৌড় ছিল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। গৌড় বলতে একটি জনগোষ্ঠীকেও বোঝানো হতো। বরাহমিহিরের (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) রচনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিম ভাগ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেকালের গৌড়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের সীমা বেড়ে গিয়েছিল। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে আজকের মুর্শিদাবাদ জেলাই ছিল সেকালের গৌড়ের প্রধান এলাকা। শশাঙ্কের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) থেকে ওড়িশার উপকূল পর্যন্ত এলাকা গৌড়ের অন্তর্গত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে গৌড় বলতে সমগ্র পাল সাম্রাজ্যকেও বোঝানো হতো।

রাঢ় অঞ্চল বলতে এখনকার পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলকে বোঝায়? সেই অঞ্চলে কী কী নদী আজও আছে?

সমতট : প্রাচীন সমতট ছিল মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের এলাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের সমভূমিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল প্রাচীন সমতট অঞ্চল। মেঘনা নদী সমতটকে বাংলার বাকি অঞ্চলের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। এই কারণে সমতটকে প্রাচীন ইতিহাসে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা বলে ধরা হতো।

হরিকেল : সমতটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আজকের বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল প্রাচীন যুগে হরিকেল নামে পরিচিত ছিল।

এবারে আসা যাক বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা শশাঙ্কের কথায়।

২.২ শশাঙ্ক

শশাঙ্ক ছিলেন এক গুপ্ত সম্রাটের মহাসামন্ত। ৬০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু কাল আগে তিনি গৌড়ের শাসক হন। শশাঙ্কের শাসনের ষাট-সত্তর বছর আগে থেকেই গৌড় ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শশাঙ্কের আমলে গৌড়ের ক্ষমতা আরও বেড়েছিল। ৬৩৭-'৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন শাসক ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ।

শশাঙ্কের শাসনকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি (মালব, কনৌজ, স্থানীশ্বর বা থানেসর, কামরূপ, গৌড় প্রভৃতি) নিজ-নিজ স্বার্থে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখত। শশাঙ্ক সেই দ্বন্দ্বে অংশ নেন। সেভাবে উত্তর-পশ্চিম বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। শশাঙ্ক সমগ্র গৌড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং ওড়িশার একাংশ নিজের অধিকারে আনতে পেরেছিলেন। উত্তর ভারতের ক্ষমতাধর রাজ্যগুলির সঙ্গে লড়াই করে শশাঙ্ক গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

টুকরো কথা

কর্ণসুবর্ণ : প্রাচীন বাংলার নগর

*পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) রেলস্টেশনের কাছে রাজবাড়িডাঙায় প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। চিনা বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। এর কাছেই ছিল সেকালের গৌড়ের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণ। চিনা ভাষায় এই বৌদ্ধবিহারের নাম **লো-টো-মো-চিহ্**। সুয়ান জাং তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) থেকে এখানে এসেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ স্থানীয় ভাবে রাজা কর্ণের প্রাসাদ নামে পরিচিত।*

সুয়ান জাং লিখেছেন যে, এই দেশটি জনবহুল এবং এখানকার মানুষেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে জমি নীচু ও আর্দ্র, নিয়মিত কৃষিকাজ হয়, অঢেল ফুল-ফল পাওয়া যায়, জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এবং এখানকার মানুষজনের চরিত্র ভালো ও তাঁরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ এবং শৈব উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বসবাস করত।

কর্ণসুবর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। আশ-পাশের গ্রাম থেকে এখানকার নাগরিকদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসত। শশাঙ্কের আমলের অনেক আগে থেকেই সম্ভবত এই অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। রক্তমৃত্তিকা থেকে জনৈক বণিক জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় অঞ্চলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল এমন নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এর থেকে কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কর্ণসুবর্ণের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটেছে বারবার। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এই শহর অল্প সময়ের জন্য কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার হাতে চলে যায়। এর পর কিছু কাল এটি জয়নাগের রাজধানী ছিল। তবে সপ্তম শতকের পরে এই শহরের কথা আর বিশেষ জানা যায় না। পাল এবং সেন যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিতে এর কোনো উল্লেখ নেই।

ছবি : ২.১ রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, কর্ণসুবর্ণ, পশ্চিমবঙ্গ

শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থানীশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় শাসক হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব। *সকলোত্তরপথনাথ* উপাধিধারী হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে হারাতে পারেননি।

শশাঙ্ক ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন শৈব বা শিবের উপাসক। *আর্যমঞ্জু শ্রীমূলকল্প* নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এবং *সুয়ান জাং*-এর ভ্রমণ বিবরণীতে তাঁকে 'বৌদ্ধবিদ্বেষী' বলা হয়েছে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হত্যা করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় স্মারক ধ্বংস করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচনা *হর্ষচরিত*-এ শশাঙ্ককে নিন্দা করা হয়েছে।

অন্যদিকে শশাঙ্কের শাসনকালের কয়েক বছর পরে *সুয়ান জাং* কর্ণসুবর্ণ নগরের উপকণ্ঠে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর চিনা পর্যটক ই-ৎসিঙ্-এরও নজরে পড়েছিল বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি। শশাঙ্ক নির্বিচারে বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে তা হতো না। বলা যায় যে, শশাঙ্কের প্রতি সব লেখকরা পুরোপুরি বিদ্বেষমুক্ত ছিলেন না। সুতরাং, শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁদের মতামত কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

শশাঙ্কের শাসনকালে গৌড়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে বলা যায় *গৌড়তন্ত্র*। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের কর্মচারী বা আমলারা একটা নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী গড়ে তুলেছিল। আগে যা ছিল গ্রামের স্থানীয় লোকের কাজ, শশাঙ্কের সময় সেই কাজে প্রশাসনও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। অর্থাৎ, ঐ আমলের গৌড় রাজ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে সরকার পরিচালনা করা হতো।

শশাঙ্কের আমলে সোনার মুদ্রা প্রচলিত ছিল (**২.২ *ছবি দেখো***)। কিন্তু তার মান পড়ে গিয়েছিল। নকল সোনার মুদ্রাও দেখা যেত। রুপোর মুদ্রা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যুগে সম্ভবত মন্দা দেখা দিয়েছিল। সমাজে জমির চাহিদা বাড়তে থাকে। অর্থনীতি হয়ে পড়ে কৃষিনির্ভর। বাণিজ্যের গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে নগরের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। আবার কৃষির গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় সমাজ ক্রমশ গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। সমাজে *মহত্তর* বা স্থানীয় প্রধানদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের গুরুত্ব ও ক্ষমতা আগেকার যুগের থেকে কমে এসেছিল। স্থানীয় প্রধানরা এ যুগে শ্রেষ্ঠীদের মতোই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল।

এ যুগে বঙ্গ এবং সমতটের শাসকরা প্রায় সকলেই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী। বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং শিব পুজোর প্রথা ছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে বৌদ্ধধর্ম বাংলার রাজাদের সমর্থন পায়নি। পরবর্তীকালে (খ্রিস্টীয়

টুকরো কথা

গৌড়বহো (গৌড়বধ)

কনৌজের শাসক যশোবর্মা বা যশোবর্মনের রাজকবি বাক্‌পতিরাজ ৭২৫-'৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রাকৃত ভাষায় গৌড়বহো কাব্য রচনা করেছিলেন। যশোবর্মন মগধের রাজাকে পরাজিত করার পর কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। মনে হয় যে, মগধের রাজা বলতে গৌড়ের রাজাকেই বোঝানো হয়েছে।

ছবি : ২.২ শশাঙ্কের মুদ্রা

অষ্টম-নবম শতকে পাল আমলে) বৌদ্ধধর্ম আবার রাজার সমর্থন পেয়েছিল।

শশাঙ্ক কোনো স্থায়ী রাজবংশ তৈরি করে যেতে পারেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ের ক্ষমতা নষ্ট হয়। বাংলায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর বছর দশেক পরে হর্ষবর্ধনও মারা যান। বাংলার নানা অংশ প্রথমে কামরূপের রাজা এবং পরে নাগ সম্প্রদায়ের জয়নাগ এবং তিব্বতের শাসকরা অধিকার করেন। অষ্টম শতকে কনৌজ এবং কাশ্মীরের শাসকরা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এই বিশৃঙ্খল সময়কে বলা হয় **মাৎস্যন্যায়ের** যুগ।

তোমার চেনা কোনো পশুর ছবি কি ২.২-এর মুদ্রায় দেখতে পাচ্ছ? কেন ঐ পশুর ছবি এই মুদ্রায় আছে বলে মনে হয়?

টুকরো কথা

মাৎস্যন্যায়

মাৎস্যন্যায় বলতে দেশে অরাজকতা বা স্থায়ী রাজার অভাবকে বোঝানো হয়। পুকুরের বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, অরাজকতার সময়ে তেমনি শক্তিশালী লোক দুর্বল লোকের ওপর অত্যাচার করে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একশো বছর ছিল বাংলার ইতিহাসে একটা পরিবর্তনের যুগ। ঐ যুগে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক ইচ্ছামতো নিজের নিজের এলাকা শাসন করত। বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসক ছিল না।

বছরের পর বছর এই অবস্থা চলার পরে বাংলার প্রভাবশালী লোকেরা মিলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচন করে (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ সময় থেকে বাংলায় পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।

২.৩ বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল : খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত

পাল রাজাদের আদি নিবাস ছিল সম্ভবত বরেন্দ্র অঞ্চলে। পাল শাসনের প্রথম একশো বছর (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে নবম শতকের মধ্যভাগ) তাদের ক্ষমতা বিস্তারের সময়। এর পরের প্রায় একশো তিরিশ বছর ধরে (খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে দশম শতকের শেষভাগ) পালদের ক্ষমতা কমতে থাকে। আবার, দশম শতকের শেষ দিক থেকে পালদের ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-'৭৪ খ্রিঃ)। বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে তিনি নিজের শাসনের আওতায় এনেছিলেন। গোপালের উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭৪-৮০৬ খ্রিঃ) উত্তর ভারতের কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম চলেছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপালের ছেলে দেবপাল (আনুমানিক ৮০৬-'৪৫ খ্রিঃ) উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজাদের মতোই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে অন্তত বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজদেশ থেকে পূর্বে প্রাগ্জ্যোতিষপুর পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেবপালের পরে পালদের ক্ষমতা কমতে শুরু করে। এর কারণ ছিল পালদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল। এ ছাড়া, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, পশ্চিম ভারতের প্রতিহার এবং ওড়িশার শাসকরা নবম শতকে বাংলা এবং বিহারের অনেক এলাকা জয় করেছিল। বাংলায় পালদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্য মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আবার, রাজা প্রথম মহীপালের সময় (আনুমানিক ৯৭৭-১০২৭ খ্রিঃ) পালশাসনের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

একাদশ শতকের শেষ দিকে রামপাল রাজা হন (আনুমানিক ১০৭২-১১২৬ খ্রিঃ)। কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল পালদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। রামপাল তা উদ্ধার করতে সফল হন। তিনি পালদের ক্ষমতাকে কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলায় পালরাজত্ব কার্যত শেষ হয়ে যায়।

পাল আমলের শাসনব্যবস্থায় সামন্ত নেতাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সব সামন্ত নেতাদের পাল আমলের বিবরণীগুলিতে রাজন, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় এরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

টুকরো কথা

পাল রাজাদের তারিখ

মালদহ জেলার হবিবপুর ব্লকের জগজ্জীবনপুরে পালযুগের একটি বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েক বছর আগে। সেখানে পাওয়া তামার লেখ থেকে জানা গেছে যে দেবপালের পরে তার বড়ো ছেলে মহেন্দ্রপাল রাজা হয়েছিলেন (৮৪৫-'৬০ খ্রিঃ)। আগে ভাবা হতো যে মহেন্দ্রপাল ছিলেন পশ্চিম ভারতের প্রতিহার বংশের রাজা। মহেন্দ্রপালের কথা জানার পরে দেবপাল-পরবর্তী পাল রাজাদের শাসন কালের তারিখ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলে গেছে।

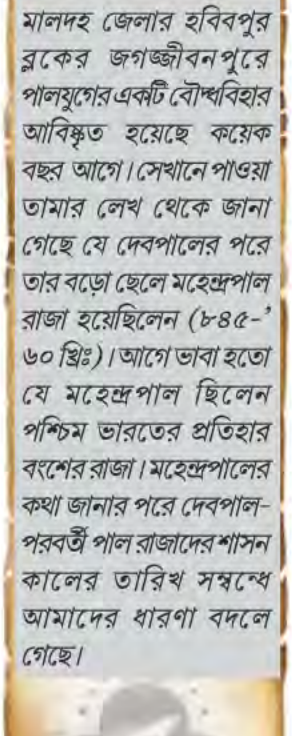

টুকরো কথা

কৈবর্ত বিদ্রোহ

পালশাসনে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল। কৈবর্তরা ছিল সম্ভবত নৌকার মাঝি বা জেলে। সে সময়ে বাংলার উত্তর ভাগে কৈবর্তদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ আছে। এই বিদ্রোহের তিনজন নেতা ছিলেন: দিব্য (দিব্বোক), রুদোক এবং ভীম। দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১০৭০-'৭১ খ্রিঃ) দিব্য ছিলেন পালরাষ্ট্রেরই কর্মচারী। পালদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি বিদ্রোহ করেন। মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্র দখল করে সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। এই বিদ্রোহ কত বড়ো আকার ধারণ করেছিল, বা দিব্যর সঙ্গে কতজন সামন্ত যোগ দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় না। মহীপালের ছোটো ভাই রামপাল দিব্যকে দমন করে বরেন্দ্র উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। কৈবর্ত রাজা ভীমও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। এ সময়ে পাল রাজাদের শাসন উত্তর বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রামপাল বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন সামন্ত-নায়কদের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। তারপর তিনি বরেন্দ্র-সহ বাংলার কামরূপ এবং ওড়িশার একাংশে পাল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে রামাবতী নগরে রামপালের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহ পাল শাসনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা জানা যায় রামচরিত কাব্য থেকে। এ সম্বন্ধে আমরা পরের অধ্যায়ে পড়ব।

২.৪ বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল

বাংলার সেন রাজারা খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে শাসন শুরু করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতক শুরু হওয়ার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সেন শাসন শেষ হয়ে যায়।

সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল, অর্থাৎ মহীশূর এবং তার আশেপাশের এলাকা। সেনরা বংশগতভাবে প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে তাঁরা ক্ষত্রিয় হয়ে যান। সেন বংশের সামন্তসেন একাদশ শতকের কোনো এক সময়ে কর্ণাট থেকে রাঢ় অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেনের আমলে রাঢ় অঞ্চলে সেনদের কিছুটা আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। হেমন্তসেনের ছেলে বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৬-১১৫৯ খ্রিঃ) রাঢ়, গৌড়, পূর্ব বঙ্গ এবং মিথিলা জয় করে সেন-রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছিলেন।

পরবর্তী শাসক বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৯-'৭৯ খ্রিঃ) পাল রাজা গোবিন্দপালকে পরাস্ত করেছিলেন। এভাবে বল্লালসেন পালরাজত্বের ওপর চূড়ান্ত আঘাত করেন। বল্লালসেন সমাজ-সংস্কার করে রক্ষণশীল, গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বল্লালসেনের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৪/৫ খ্রিঃ) প্রয়াগ, বারাণসী এবং পুরীতে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) ছিল ওই আমলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণ ঘটলে বাংলায় সেন শাসনের কার্যত অবসান ঘটেছিল।

ছক ২.১ : এক নজরে বাংলা ও বিহারে পাল ও সেন রাজাদের শাসন

রাজবংশ	সময়কাল	কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসক	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
পাল	৭৫০—১২০০ খ্রিস্টাব্দ	গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, রামপাল	ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা, শিক্ষা-শিল্প-স্থাপত্যের বিকাশ, কৈবর্ত বিদ্রোহ
সেন	খ্রিস্টীয় একাদশ শতক—১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ)	বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন	বর্ণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি, তুর্কি অভিযান

লক্ষ করে দেখো যে, পাল রাজাদের শাসনের শেষ দিকেই বাংলায় সেন শাসন শুরু হয়। তার মানে হলো, খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বাংলার উপরে আর পাল রাজাদের কর্তৃত্ব তেমন ভাবে ছিল না। কেবল পূর্ব বিহারে এবং উত্তর বাংলায় পাল রাজাদের শাসন টিকে ছিল। এই সুযোগে সেন বংশের সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল শাসনের শেষ দিকে কৈবর্ত বিদ্রোহ সেনদের রাজ্যস্থাপনে সাহয্য করেছিল।

২.৪ অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

এতক্ষণ আমরা বাংলার কথা পড়লাম। বাংলার বাইরে খ্রিস্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু নতুন রাজবংশ এবং রাজত্বের উত্থান হয়েছিল। এই নতুন রাজবংশগুলি স্থানীয় শক্তিশালী

ব্যক্তিদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল। বড়ো বড়ো জমির মালিক বা যোদ্ধৃনেতাদের অনেক ক্ষেত্রে সামন্ত, মহাসামন্ত বা মহা-মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হতো। তার বদলে এঁরা রাজা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে খাজনা ও উপঢৌকন দিত। এমনকি প্রয়োজনে রাজার ডাকে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে হাজির হতো। কখনও আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে শুরু করেছিল। যেমন, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা কর্ণাটকের চালুক্যশক্তির অধীন ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক রাষ্ট্রকূট নেতা দন্তিদুর্গ চালুক্য শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেই স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। অনেক সময় সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী মানুষেরা পারিবারিক শক্তির সাহায্যে নতুন রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হতো। এইরকম কয়েকটি রাজবংশের কথা এখানে আমরা জানব।

প্রথমে উত্তর ভারত দিয়ে শুরু করা যাক। বাংলা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। দ্বিতীয় শক্তি ছিল গুর্জর-প্রতিহার। এঁরা রাজস্থান ও গুজরাটের বৃহৎ অঞ্চল শাসন করতেন। এদের মধ্যে রাজা ভোজ (৮৩৬-'৮৫ খ্রিস্টাব্দ) খুব ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি কনৌজ দখল করে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, বহু আক্রমণের মুখে প্রতিহাররা দুর্বল হয়ে পড়ে।

হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই কনৌজ উত্তরাপথের অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যে কনৌজ নিয়ন্ত্রণ করবে সেই গাঙ্গেয় উপত্যকা দখলে রাখতে পারবে তা বোঝা গিয়েছিল। এই অঞ্চলের নদী-ভিত্তিক বাণিজ্য এবং খনিজ দ্রব্য আর্থিক দিক থেকে লোভনীয় ছিল। কনৌজ শেষ পর্যন্ত কে দখলে রাখতে পারবে, এই নিয়ে অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে টানা লড়াই চলেছিল। একেই *ত্রি-শক্তি সংগ্রাম* বলা হয়। প্রায় দুশো বছর ধরে চলা যুদ্ধ-কলহে তিনটি বংশেরই শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে পাল রাজাদের ক্ষমতা কমে গেলে বাংলায় সেন রাজত্ব শুরু হয়েছিল।

২.৬ দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতেও বেশ কিছু আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল। পল্লব, পাণ্ড্য এবং বিশেষত চোলরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির ব-দ্বীপকে ঘিরে চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানকার রাজা মুট্টারাইয়াকে সরিয়ে বিজয়ালয় (৮৪৬-৮৭১ খ্রিঃ) চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর নামে এক নতুন নগরী তৈরি হয় যা চোলদের

টুকরো কথা

রাজপুত

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের কথা বারবার বলা হয় তারা হলো রাজপুত। রাজপুত কারা, এদের দেশ কোথায়—এসব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে হূণদের আক্রমণের পরে বেশ কিছু মধ্য-এশীয় উপজাতির মানুষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাহও হয়। এদের বংশধরদের রাজপুত বলা হয়। তবে রাজপুতরা নিজেদেরকে স্থানীয় ক্ষত্রিয় বলে মনে করত। নিজেদের চন্দ্র, সূর্য বা অগ্নি দেবতার বংশধর বলে মনে করত তারা।

রাজধানী ছিল। বিজয়ালয়ের উত্তরসূরিরা রাজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করেন। দক্ষিণের পাণ্ড্য এবং উত্তরের পল্লব অঞ্চল চোলদের দখলে আসে। ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজরাজ বর্তমান কেরল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল প্রতিপত্তি বাড়ান। তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৬-১০৪৪ খ্রিঃ) কল্যাণীর চালুক্যশক্তিকে পরাজিত করেন। বাংলার পালবংশের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গঙ্গা নদীর তীরে পালরাজাকে হারিয়ে তিনি *গঙ্গাইকোণ্ডচোল* উপাধি নেন। প্রথম রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোল দুজনেই দক্ষ নৌবাহিনী তৈরি করেন। তার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা চোলদের পক্ষে সম্ভব হয়।

মানচিত্র : ২.২ : খ্রিস্টীয় নবম শতকের ভারতবর্ষ

২.৭ ইসলাম ও ভারত

এতক্ষণ আমরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু কথা পড়লাম। এই সময়েই ভারতের সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ভারতের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর এই যোগাযোগের গভীর প্রভাব পড়েছিল।

ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগে আরব উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশই মরুভূমি বা শুকনো ঘাসজমি অঞ্চল। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর। এখানে বৃষ্টিপাত সামান্যই হয়। মক্কা এবং মদিনা এখানকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার যাযাবর মানুষদের বলা হতো বেদুইন। তারা উট পালন করত। খেজুর এবং উটের দুধ ছিল এদের অন্যতম খাদ্য। এই মানুষেরা নিজেদের আরব বলে পরিচয় দিত।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শুরুতে, কিছু কিছু আরব উপজাতি ব্যবসাকেই প্রধান জীবিকা করেছিল। মক্কা শহর দুটি বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই নগরের দখলদারি নিয়ে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে নতুন এক ধর্মের জন্ম হলো। তার নাম ইসলাম। ঐ শতকে হজরত মহম্মদ মক্কাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোষণা করেন যে আল্লাহ্ বা ঈশ্বর তাঁকে দূত মনোনীত করেছেন। সে জন্যই মহম্মদকে ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক বলা হয়। আল্লাহর বাণী সাধারণ মানুষ মহম্মদের থেকেই জানতে পারেন। ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত।

বিভিন্ন আরব উপজাতিদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ বন্ধ করার জন্য মহম্মদ একটি বিশ্বাসকেই চালু করেছিলেন। ফলে উপজাতিগুলির মধ্যে ঐক্য তৈরি হতে থাকে। তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠিত মক্কাবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণের সাথে মহম্মদের ধর্মীয় মতের যথেষ্ট ফারাক ছিল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীরা মদিনা শহরে চলে আসেন। মক্কা থেকে মদিনায় এই চলে যাওয়াকে আরবি ভাষায় হিজরত বলা হয়। পরে ঐ সময় থেকে হিসাব করেই *হিজরি* নামেই ইসলামীয় সাল গণনা শুরু হয়। দশ বছরের মধ্যেই মহম্মদ আরব ভূখণ্ডের বিরাট অঞ্চল জয় করেন। মক্কাতেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদ পরলোক গমন করেন। ততদিনে অবশ্য আরবের মূল ভূখণ্ডে ইসলাম ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

ভারত ও আরব সভ্যতা

ভারতের সঙ্গে ইসলামের প্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল তুর্কিরা এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে আরব বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসতেন। সিন্ধু মোহনায়, মালাবারে আরবি মুসলিম বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এর থেকে যেমন আরবি বণিকরা লাভবান হয়েছিল, তেমনি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভ করত। শাসকরাও এর থেকে লাভবান হয়েছিল। হিন্দু, জৈন এবং মুসলিম বণিকদের এই বাণিজ্য ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঐ যুগে বাগদাদের খলিফাদের উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

টুকরো কথা

খলিফা ও খিলাফৎ

মহম্মদের পর ইসলাম জগতের নেতৃত্ব কে দেবেন— তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন মহম্মদের প্রধান চার সঙ্গীরা একে একে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। এদের বলা হয় *খলিফা*। খলিফা শব্দটা আরবি। তার মানে প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী। প্রথম খলিফা ছিলেন আবু বকর। খলিফাই হলেন ইসলামীয় জগতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা। যেসব অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলি হলো *দার-উল ইসলাম*। খলিফা এই পুরো দার-উল ইসলামের প্রধান নেতা। তাঁর অধিকারের অঞ্চলের নাম *খিলাফৎ*।

৭১২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরবি মুসলমানরা মহম্মদ বিন কাশেমের নেতৃত্বে সিন্ধু প্রদেশে অভিযান করেন। ইতোমধ্যে আরব ব্যবসায়ী এবং পর্যটকরা খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকেই ভারতে এসেছিলেন। অর্থাৎ, ভারতের সঙ্গে ইসলামের পরিচয় রাজ্যবিস্তারের আগেই শুরু হয়েছিল।

আরব শক্তি সিন্ধু প্রদেশ, মুলতান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অঞ্চল দখল করে। বিন কাশেমের মৃত্যুর পর তারা ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল থেকে সরে যেতে থাকে। আরবরা নবম শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে অভিযান বন্ধ করে দেয়।

আরবদের পর, আরেক মুসলমান শক্তি তুর্কিরা ভারতের সম্পদের টানে ভারত আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মাহমুদ এবং ঘুরের শাসক মুইজউদ্দিন মহম্মদ বিন সাম (মহম্মদ ঘুরি)—এই দুই তুর্কি শাসক ভারতীয় উপমহাদেশে বিজয় অভিযানে আসেন। অবশ্য উভয়ের উদ্দেশ্য এক ছিল না। গজনির মাহমুদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরগুলি থেকে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে খোরাসান এবং মধ্য এশিয়ায় তাঁর সাম্রাজ্যে তা ব্যয় করা। আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাহমুদ প্রায় সতেরোবার উত্তর ভারত আক্রমণ করেন।

টুকরো কথা

গজনির সুলতান মাহমুদ

সুলতান মাহমুদ ভারতের ইতিহাসে একজন আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু তিনি শুধুই একজন যোদ্ধা ছিলেন না। ভারত থেকে তিনি যেমন প্রচুর সম্পদ লুঠ করেছেন, তেমনি নিজের রাজ্যে ভালো কাজে তা ব্যয় করেছেন। তাঁর আমলে রাজধানী গজনি এবং অন্যান্য শহরকে

টুকরো কথা

কোরান ও কাবা

ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো কোরান। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে কোরান আল্লাহ্‌র বাণী।

*মক্কায় **মসজিদ-ই হরম** নামে একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদের মাঝখানে **কাবা** নামে একটি পবিত্র ভবন আছে। এরই আরেক নাম **বাইতুল্লাহ**। এই ভবনের এক কোণে কালো রং-এর একটি ছোটো পাথর আছে, যাকে **হাজার উল আসওয়াদ** বলা হয়। কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে থেকেই আরবদের তীর্থক্ষেত্র ছিল কাবা শরীফ। পরবর্তীকালে কাবা শরীফ ইসলামের তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।*

সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মাহমুদ সেখানে প্রাসাদ, মসজিদ, গ্রন্থাগার, বাগিচা, জলাধার, খাল এবং আমু দরিয়ার (নদী) উপর বাঁধ নির্মাণ করেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন যেখানে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাহমুদের আমলে দু-জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন অল বিরুনি এবং ফিরদৌসি। অল বিরুনি ছিলেন দর্শন এবং গণিতে পণ্ডিত। ভারতে তিনি পর্যটক হিসাবে আসেন। তাঁর লেখা কিতাব অল-হিন্দ সে সময়ের ভারতের ইতিহাস জানার জন্য জরুরি গ্রন্থ। কবি ফিরদৌসি, শাহনামা কাব্য লিখেছিলেন।

অন্যদিকে মহম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষের শাসক হতে চেয়েছিলেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তিনি রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হারিয়ে দেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি মারা যান। ঘুরির অন্যতম সঙ্গী কুতুবউদ্দিন আইবক সেই সময়ে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় তুর্কি অভিযান

আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল।

টুকরো কথা

মাত্র আঠারোজন ঘোড়সওয়ার মিলে বাংলা জয়! তা-ও কি হয়?

তুর্কি আক্রমণের প্রায় চল্লিশ বছর পরে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ বাংলায় এসে বখতিয়ার খলজির অভিযানের কাহিনি শুনেছিলেন। তাঁর লেখা *তবকাত-ই নাসিরি* থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খলজি এবং তাঁর তুর্কি বাহিনী ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নদিয়ায় ঢুকেছিলেন। সে সময় বাংলা থেকে উত্তর দিকে তিব্বত পর্যন্ত ঘোড়ার ব্যবসা বেশ চালু ছিল। কাজেই তুর্কিদের নদিয়ায় ঢুকতে দেখে কেউই তাদের আক্রমণকারী ভাবেনি।এই নদিয়া কোথায় ছিল?

হয়তো এই নদিয়া ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরে, যা আজ নদীর তলায় চলে গেছে। অথবা হয়তো বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নৌদা গ্রামই হলো সেকালের নদিয়া। সে যাই হোক, তুর্কি অভিযানের সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন নদিয়ায় ছিলেন।

গল্প আছে যে, বখতিয়ারের সঙ্গে মাত্র সতেরো জন সৈন্য ছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সেকালে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসার একাধিক রাস্তা

টুকরো কথা

পরবর্তী খিলাফৎ

প্রথম চারজন খলিফার পরে খলিফা পদটি কয়েকটি রাজবংশের হাতে চলে যায়। যেমন- উম্মাইয়া, আব্বাসিয়া, ফতিমিদ, অটোমান প্রভৃতি। উম্মাইয়া খিলাফৎ (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) গড়ে উঠেছিল সিরিয়ার দমাস্কাসকে কেন্দ্র করে। আব্বাসিয়া খিলাফৎ (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) -এর রাজধানি ছিল বোগদাদ। খলিফা আল হারুন-আল রসিদ আব্বাসিদের মধ্যে বিখ্যাত খলিফা। আব্বাসিয়াদের ক্ষমতা শেষ কয়েক শতকে কমে যায়। তখন মিশরে ফতিমিদ খিলাফৎ (৯০৯-১১৭১ খিস্টাব্দ) -এর শাসক ছিল। এবং ঐ সময় উম্মাইয়ারাও আবার স্পেনে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করে (৯২৯-১০৩১ খ্রিস্টাব্দ)। অটোমানরাও তাদের খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৫১৭-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই ভাবে খলিফা ও খিলাফতের ধারা চলেছিল।

ছিল। সাধারণত বিহার থেকে বাংলায় আসার সময়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তর দিকের পথ ধরেই আসা হতো। রাজা লক্ষ্মণসেনও ওই পথে তুর্কি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজি তাঁর সৈন্যদের অনেকগুলি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন।

তখন দুপুরবেলা, বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন খেতে বসেছিলেন। তুর্কিরা আসছে শুনে তিনি কোনো প্রতিরোধ না করে পূর্ববঙ্গের দিকে চলে যান।

তুর্কিরা বিনা যুদ্ধেই নদিয়া জয় করে। এরপর বখতিয়ার নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহরকে সমকালীন ঐতিহাসিকরা লখনৌতি বলে উল্লেখ করেছেন।

বখতিয়ার খলজি নিজের নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইসব শাসনকর্তারা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের আস্তানা তৈরি করে দেন।

লখনৌতি রাজ্যের সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজি অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে রাজ্যবিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি মারা যান। বাংলায় তুর্কি অভিযানের একটা অধ্যায় শেষ হয়। ঐ একই সময়ে পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু ঘটেছিল।

ছবি ২.৩ : মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা একটি ছবি

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো : **পূর্ণমান ১**

(ক) বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ____________ (ঐতরেয় আরণ্যক/আইন-ই-আকবরি/অর্থশাস্ত্র) গ্রন্থে।

(খ) প্রাচীন বাংলার সীমানা তৈরি হয়েছিল ____________, ____________ এবং ____________ (ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা/গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু/কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী) নদী দিয়ে।

(গ) সকলোত্তরপথনাথ উপাধি ছিল ____________ (শশাঙ্কের/হর্ষবর্ধনের/ধর্মপালের)।

(ঘ) কৈবর্ত বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন ____________ (ভীম/রামপাল/প্রথম মহীপাল)।

(ঙ) সেন রাজা ____________ (বিজয়সেনের/বল্লালসেনের/লক্ষ্মণসেনের) আমলে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ঘটে।

(চ) সুলতানি যুগের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন ____________ (মহম্মদ ঘুরি/মিনহাজ-ই সিরাজ/ ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি।)

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো : **পূর্ণমান ১**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
বজ্রভূমি	বৌদ্ধ বিহার
লো-টো-মো-চিহ্	আধুনিক চট্টগ্রাম
গঙ্গাইকোণ্ডচোল	বাক্‌পতিরাজ
গৌড়বহো	উত্তর রাঢ়
হরিকেল	অল বিরুনি
কিতাব অল-হিন্দ	প্রথম রাজেন্দ্র

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো : **পূর্ণমান ৩**

(ক) এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র দেখো। তাতে আদি-মধ্য যুগের বাংলার কোন কোন নদী দেখতে পাবে?

(খ) শশাঙ্কের আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল তা ভেবে লেখো।

(গ) মাৎস্যন্যায় কী?

(ঘ) খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি কেমন ভাবে গড়ে উঠেছিল?

(ঙ) সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? কীভাবে তারা বাংলায় শাসন কায়েম করেছিলেন?

(চ) সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে লুঠ করা ধনসম্পদ কী ভাবে ব্যবহার করেছিলেন?

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :** **পূর্ণমান ৫**

(ক) প্রাচীন বাংলার রাঢ়-সুহ্ম এবং গৌড় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় দাও।

(খ) শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক কেমন ছিল, সে বিষয়ে তোমার মতামত দাও।

(গ) ত্রিশক্তি সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল?

(ঘ) ছক ২.১ ভালো করে দেখো। এর থেকে পাল ও সেন শাসনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করো।

(ঙ) দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করো। কোন কোন অঞ্চল চোল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল?

(চ) ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে আরব দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব দেশে কী বদল এনেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) মনে করো তুমি রাজা শশাঙ্কের আমলের একজন পর্যটক। তুমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছ। পথে তুমি কোন কোন অঞ্চল ও নদী দেখতে পাবে? কর্ণসুবর্ণে গিয়েই বা তুমি কী দেখবে?

(খ) মনে করো দেশে মাৎস্যন্যায় চলছে। তুমি ও তোমার শ্রেণির বন্ধুরা দেশের রাজা নির্বাচন করতে চাও। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।

(গ) মনে করো যে তুমি কৈবর্ত নেতা দিব্য। পাল রাজাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগুলি কী কী থাকবে? কীভাবেই বা তুমি তোমার বিদ্রোহী সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করবে তা লেখো।

(ঘ) মনে করো তুমি বাংলায় তুর্কি আক্রমণের দিন দুপুরবেলায় নদিয়া শহরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলে। সেই সময় কী দেখলে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা
খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

৩.১ ভারতের অর্থনীতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে ভারতের অর্থনীতির কথা। বিশেষ করে ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারত এবং পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকেই উত্তর ভারতের বেশ কিছু জায়গায় ব্যাবসা-বাণিজ্যের মন্দা দেখা গিয়েছিল। নগরগুলির খারাপ অবস্থা পর্যটকদের চোখে পড়েছিল। পুরোনো বাণিজ্য-পথগুলির গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তবে নতুন বাণিজ্য পথ বা নতুন শহর গড়ে ওঠেনি তাও নয়। *সুয়ান জাং* থানেশ্বর, কনৌজ ও বারাণসীতে ব্যবসায়িক কাজকর্মের রমরমার উল্লেখ করেছেন। আবার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবেও স্থানীশ্বর এবং কনৌজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্দর নগরীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং নবম শতাব্দী থেকে আরব বণিকদের যাতায়াত বেড়ে যাওয়ায়ও বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। গ্রামীণ বাজারে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য শস্য বেচাকেনা অনেকগুণ বেড়েছিল। বিশেষত আখ, তুলো এবং নীলের হাট অনেক অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল। এসময়ে উত্তর ভারতে ভালো মানের সোনা বা রুপোর মুদ্রার অভাব ছিল। তবে সমকালীন গ্রন্থগুলিতে বহু ধরনের মুদ্রার নাম পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলি কতটা চলত, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

৩.১.১. ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা

আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলির বাড়-বাড়ন্তের ছাপ সে সময়ের ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতিতে পড়েছিল। সমাজে এক বিশেষ গোষ্ঠীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। সমকালীন লেখকরা *সামন্ত, রাজ, রৌণক*—এসব নামে ঐ গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু ছিল উঁচু রাজকর্মচারী। তাদের নগদ বেতন না দিয়ে অনেক সময়ে জমি দেওয়া হতো। সেই জমির রাজস্বই ছিল ঐ কর্মচারীদের আয়।

আবার কিছু অঞ্চলে যুদ্ধে হেরে যাওয়া রাজারাও সেই অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করত। কখনওবা যুদ্ধপটু উপজাতি নেতারা কোনো কোনো অঞ্চলে কর্তৃত্ব করত।

এই গোষ্ঠীগুলির এক জায়গায় মিল ছিল। এরা কেউই পরিশ্রম করে উৎপাদন করত না। অন্যের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বা রাজস্ব থেকে নিজেরা জীবিকা চালাত। এই অন্যের শ্রমভোগী গোষ্ঠীর মধ্যেও স্তরভাগ ছিল। কেউ ছিল একটি গ্রামের

প্রধান। কেউ বা কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে একটা অঞ্চলের দখল রাখত। একটি বিরাট অঞ্চলের উপরেও কর্তৃত্ব ছিল কারো কারো। এভাবেই রাজা, গোষ্ঠীর শাসক এবং জনগণকে নিয়ে একটি স্তরভেদ তৈরি হয়েছিল সমাজে। মহাসামন্ত, সামন্তদের মধ্যে সবসময়েই যুদ্ধ-ঝগড়া চলত। সবাই চাইত নিজের ক্ষমতা আরও খানিক বাড়িয়ে নিতে। কখনোবা এরা জোট বেঁধে রাজার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে নামত। একসময়ে দখল করা গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি, গ্রামের শাসন এবং বিচারও করত এই গোষ্ঠী। রাজার ক্ষমতাকেও এরা অনেক সময়ে অস্বীকার করত। এর ফলে রাজশক্তির দুর্বলতা পরিষ্কার হয়ে যায়। সামন্ত নেতাদের দাপটে গ্রামগুলির স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও নষ্ট হয় (**স্বায়ত্তশাসন নিয়ে আরও জানবে নবম অধ্যায়ে**)।

সেই সমাজের ছবি আঁকলে সেটি হবে এরকম :

দেখো, ত্রিভুজটি নীচের দিকে চওড়া হয়েছে। তার মানে, নীচে অনেক জনগণ, তাদের উপর বেশ কিছু সামন্ত বা মাঝারি শাসক। মাঝারি শাসকদের উপরে অল্প কিছু মহাসামন্ত। আর সবার উপরে রাজা। রাজস্ব ও শাসনের অধিকার এইভাবে স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকে 'সামন্ত ব্যবস্থা' বলে।

টুকরো কথা

ইউরোপে সামন্ততন্ত্র

খ্রিস্টীয় নবম শতকে পশ্চিম ইউরোপে এক রকম সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল। একে *সামন্ততন্ত্র* বলে। সামন্ত সমাজের কাঠামো ছিল ত্রিভুজের মতো। তার নানা স্তরে ছিলেন রাজা, বিভিন্ন সামন্ত এবং উপসামন্ত। সামন্তপ্রভুদের অধীন নাইটরা লোহার পোশাক পরে, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। প্রত্যেক সামন্তপ্রভু বহু দুর্গ তৈরি করেন। সামন্তপ্রভুদের ম্যানর বা খামারে ভূমিদাস বা সার্ফদের খাটিয়ে উৎপাদন করা হতো। এ ছাড়া ছিলেন স্বাধীন চাষী। চাষবাস ছাড়া বাণিজ্যও হতো। গড়ে উঠেছিল নগর। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক ছিল ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সেরা সময়। এর দেড়শো-দুশো বছর পর থেকে এই ব্যবস্থায় ভাঙন ধরতে থাকে। তবে, ষোড়শ শতকের ইউরোপের পূর্ব ভাগে আবার ভূমিদাস প্রথা কিছু কালের জন্য ফিরে এসেছিল।

৩.১.২ দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতের রাজশক্তিগুলি বহু মন্দির তৈরি করেছিল। সেগুলি শুধুমাত্র পুজোর জন্যই ব্যবহৃত হতো না। তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে চোল শাসক রাজরাজ এবং রাজেন্দ্রর সময়ে দুটি অসাধারণ সুন্দর মন্দির তৈরি হয়। মন্দির ঘিরে লোকালয় এবং শিল্পীদের বসবাস গড়ে উঠত। মন্দির কর্তৃপক্ষকে রাজা, ব্যবসায়ী ও অভিজাতরা নিষ্কর জমি দান করতেন। সেই জমির ফসল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের জীবনযাপনের জন্য লেগে যেত। পুরোহিত, মালাকার, রাঁধুনি, গায়ক, নর্তক-নর্তকী প্রমুখ মন্দির চত্বরে থাকত। চোল রাজ্যের ব্রোঞ্জ হস্তশিল্প খুব বিখ্যাত ছিল। তামিলনাড়ু অঞ্চলে কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলি থেকে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়ে, কোথাও বছরে দু-বার ফসল ফলানোও সম্ভব হয়। যেখানে সেচের সুযোগ কম ছিল, সেখানে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, বিল কাটা হতো। কোথাও কুয়োর ব্যবস্থাও ছিল।

চোল রাজ্যের প্রধান ছিলেন রাজা। তাঁকে মন্ত্রীদের এক পরিষদ সহায়তা করত। রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা *মণ্ডলমে* ভাগ করা হয়েছিল। কৃষকদের বসতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামকে শাসন করত গ্রাম-পরিষদ বা *উর*। এই রকম কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গঠিত হতো *নাড়ু*। উর এবং নাড়ু— এই দুই স্থানীয় সভা স্বায়ত্তশাসন, বিচার এবং রাজস্ব বা কর সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করত। ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মদেয় জমি দেওয়ার ফলে কাবেরী উপত্যকায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বহু নতুন নতুন গ্রামের পত্তন হয়েছিল। এই নতুন গ্রামগুলিকে তদারকি করার জন্য বয়স্ক মানুষদের নিয়ে তৈরি হতো সভা। তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার জন্য 'নগরম' নামের আরেকটি পরিষদ তৈরি হয়েছিল।

কর সংগ্রহ করা কাকে বলে? এখন কী কী ভাবে কর সংগ্রহ করা হয়?

দক্ষিণ ভারতে অবশ্য নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় যে চেট্টি বা বণিকরা পণ্য সাজিয়ে যাতায়াত করতেন। বিভিন্ন বণিক সংগঠন বা সমবায়ের কথাও জানা যায়। ঐ সংগঠনগুলি বিভিন্ন মন্দিরকে জমি দান করতেন, সেরকম বর্ণনা দক্ষিণ ভারতে তাম্রলেখগুলিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চোলদের ক্ষমতা বাড়ায় সেখানকার বাণিজ্যের উপর ভারতীয় বণিকদের প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়েছিল।

এই সময় রাজারা অনেকেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উপাধিতে নিজেদেরকে ভূষিত করতেন। যেমন *মহারাজা-অধিরাজ, ত্রিভুবন-চক্রবর্তীন* এই রকম সব। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় সামন্ত বা ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতেন। কৃষক, পশুপালক এবং কারিগরদের উৎপাদন থেকে রাজা ভাগ নিতেন। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও কর সংগ্রহ করা হতো। সেখান থেকেই রাজার বিলাসবহুল জীবন চলত। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা, দুর্গ এবং মন্দির বানানোয় সেই অর্থ খরচ করা হতো। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় বিজয়ী শক্তির সৈন্যরাও পরাজিত অঞ্চলে যথেষ্ট লুঠপাট চালাত। স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবারগুলোর হাতেই খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হতো। খাজনার একাংশ ঐ পরিবারগুলি নিজেদের জন্য রেখে, বাকি অংশ রাজকোষাগারে জমা দিত। কোনো কোনো সময় পরাজিত রাজাদের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বুঝে তাদের অধীনতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে জমি-জায়গা দান হিসাবে ফেরত দেওয়া হতো। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণদের অনেক সময় জমি দান করা হতো। তারা অনাবাদী জমি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি তৈরি করতেন। ব্রাহ্মণদের কিছু জমি দেওয়া হতো, যার কর নেওয়া হতো না। এই জমি দানের ব্যবস্থাকে ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থা বলা হতো।

রাজারা কেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করতেন বলে মনে হয়?

৩.১.৩ পাল-সেন যুগের বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি

পাল-সেন যুগে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে এই যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশই কমে এসেছিল। ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপটের ফলে বাংলার বণিকরা পিছু হটেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার যোগ ছিল। পাল-সেন যুগের বাংলায় সোনা-রুপোর মুদ্রার ব্যবহার খুব কমে যায়। কড়িই হয়ে উঠেছিল জিনিস কেনা-বেচার প্রধান মাধ্যম।

এই সময়ের কৃষিনির্ভর সমাজে ভূমিদানের অনেক নিদর্শন আছে। পাল যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজারা ভূমিদান করতেন। সেন যুগে অনেক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে। সে আমলের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে জমি কেনা-বেচার সময় কৃষককেও তার খবর দিতে হতো। সুতরাং, সমাজে কৃষককে নিতান্ত অবহেলা করা হতো না। তবে জমিতে মূল অধিকার ছিল রাষ্ট্র বা রাজার।

রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬ ভাগ) কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভোগের জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করতেন। বণিকরাও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর

ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপরেও কর দিতে হতো গ্রামবাসীদের। এছাড়া হাট এবং খেয়াঘাটের উপরে কর চাপানো হতো।

এই যুগের প্রধান ফসলগুলি ছিল ধান, সর্ষে এবং নানারকমের ফল যেমন আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, নারকেল ইত্যাদি। আজকে বাঙালির খাদ্যতালিকায় ডাল একটি প্রধান উপাদান। অথচ, সে যুগের শস্যের মধ্যে ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ ছাড়া কার্পাস বা তুলো, পান, সুপুরি, এলাচ, মহুয়া ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গ্রামের আশে-পাশে ঘন বাঁশবন এবং নানারকম গাছের কথা জানা যায়। সেগুলির কাঠ ছিল এ যুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নদনদীপূর্ণ বাংলার আরেকটি বড়ো সম্পদ ছিল মাছ।

সে যুগের বাংলার প্রধান ফসলগুলির ও পশু-পাখির মধ্যে কোনগুলি আজকের পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায়?

টুকরো কথা

বাঙালির খাওয়া-দাওয়া

যে-দেশে ধানই হলো প্রধান ফসল সে-দেশে ভাতই যে মানুষের প্রধান খাদ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। গরম ভাতে গাওয়া ঘি, তার সঙ্গে মৌরলা মাছ, নালতে (পাট) শাক, সর-পড়া দুধ আর পাকা কলা দিয়ে খাবারের বর্ণনা আছে প্রাচীন কাব্যে। গরিব লোকের খাদ্যতালিকায় থাকত নানা ধরনের শাক-সবজি। আজ আমরা যে-সব সবজি খাই যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল, ডুমুর, কচু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির খাবারে জায়গা করে নিয়েছে। নদীনালার দেশে রুই, পুঁটি-মৌরলা, শোল, ইলিশ ইত্যাদি মাছ খাওয়ার অভ্যেসও ছিল। সেকালে বাঙালি সমাজের সব লোকে না খেলেও অনেকেই হরিণ, ছাগল, নানা রকমের পাখি ও কচ্ছপের মাংস, কাঁকড়া, শামুক, শুকনো মাছ ইত্যাদি খেত। অনেক পরে মধ্যযুগে পোর্তুগিজদের কাছ থেকে বাঙলার লোকেরা আলু খেতে শিখেছে। ডাল খাওয়ার অভ্যেস হয়তো বাঙালি পেয়েছে উত্তর ভারতের মানুষদের কাছ থেকে। তা ছাড়া আখের গুড়, দুধ এবং তার থেকে তৈরি দই, পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি ছিল বাঙালির প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু। আর ছিল বাংলায় উৎপন্ন লবণ। মহুয়া এবং আখ থেকে তৈরি পানীয়ও বাঙালি সমাজে চালু ছিল।

গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে ছিল গোরু, বলদ, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা, কাক, কোকিল, নানান জলচর পাখি, ঘোড়া, উট, হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, বানর, হরিণ, শূকর, সাপ ইত্যাদি। এর মধ্যে ঘোড়া এবং উট বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল।

শিল্পদ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র ছিল প্রধান সামগ্রী। বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড়ের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠ এবং ধাতুর তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস, গয়নার কথা জানা যায়। ঘর-বাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার থেকে বোঝা যায় যে সে যুগে কাষ্ঠশিল্পীরা সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেতেন। শিল্পীরা বিভিন্ন নিগম বা গোষ্ঠীতে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন।

টুকরো কথা

চক্রপাণিদত্ত

চক্রপাণিদত্ত ছিলেন পালযুগের একজন নামকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। তাঁর বাড়ি ছিল সম্ভবত বীরভূম জেলায়। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক ও সুশ্রুতের রচনার ওপর তিনি টীকা লিখেছিলেন। এ ছাড়া, ভেষজ গাছ-গাছড়া, ওষুধের উপাদান, পথ্য নিয়েও তিনি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা সেরা বই হলো চিকিৎসা-সংগ্রহ।

৩.২ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

পালযুগ বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময়কাল। আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার গৌড়-বঙ্গীয় রূপ থেকে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। সেটাই ছিল সাধারণ, নিরক্ষর লোকের ভাষা।

সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র তখনও প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হত। ঐ ভাষা শিক্ষিত, পণ্ডিত এবং সমাজের উঁচু তলার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্য বা চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইগুলো সংস্কৃত ভাষাতে লেখা।

টুকরো কথা

রামচরিত

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ রামপালের ছেলে মদনপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১১৪৩-'৬১খ্রিঃ) রামচরিত কাব্য লিখেছিলেন।

রামচরিতের কাহিনি রামায়ণের গল্প অনুসারে লেখা হয়েছে। এতে কবি একই কথার দু-রকম মানে করেছেন। তিনি একদিকে রামায়ণের রাম এবং অন্যদিকে পালরাজা রামপালের কথা লিখেছেন।

রামায়ণের আদলে লেখা হলেও এই কাব্য শুধুই বাল্মীকি-রামায়ণের পুনরাবৃত্তি নয়। এই কাব্যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বাংলার প্রেক্ষাপটে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। রামায়ণের ভূগোল আর রামচরিতের ভৌগোলিক বিবরণ এক নয়। রামায়ণের অযোধ্যার বদলে এখানে রামপালের রাজধানী রামাবতীর কথা বলা হয়েছে। রামায়ণের সীতা উদ্ধারের কাহিনির সঙ্গে রামপালের বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণে সীতার খোঁজে রামের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে। এর সঙ্গে তুলনা করে রামচরিতে বলা হয়েছে যে, রামপাল তাঁর রাজ্যে সামন্তদের সমর্থন জোগাড় করার জন্য নানা জায়গায় ঘুরছেন। ঐ সামন্তদের সাহায্যেই রামপাল কৈবর্তদের হাত থেকে তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ, সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণের সীতা এবং পাল শাসকের আমলের বরেন্দ্রভূমিকে এক করে দিয়েছেন। সীতার

রূপবর্ণনার মাধ্যমে বরেন্দ্রভূমি এবং চারপাশের এলাকার নদনদী, ফুলফল, গাছপালা, ফসল, বর্ষাকাল ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে রাম এবং রামপালের গল্প লিখতে গিয়ে রামচরিতের ভাষা জটিল হয়ে পড়েছে। এর ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই কাব্য পণ্ডিত ও শিক্ষিত মানুষদের জন্যই লেখা হয়েছিল সাধারণ মানুষের এই কাব্যপড়ার সামর্থ্য ছিল না।

পাল রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সম্ভবত ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তবে শশাঙ্কের আমলের বৌদ্ধধর্মের থেকে পালযুগের বৌদ্ধধর্ম অনেকটা আলাদা ছিল। পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা মিলে গিয়ে বজ্রযান বা তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের জন্ম হয়েছিল। এই মতের নেতাদের বলা হতো সিদ্ধাচার্য। এছাড়া সহজযান ও কালচক্রযান নামে আরো দু-রকমের বৌদ্ধ ধর্মমতের এ সময় জন্ম হয়। সহজযানকে সহজিয়াও বলা হয়।

এই ধর্মীয় ভাবনায় না ছিলো দেবদেবীর স্বীকৃতি, না মন্ত্র-পুজো-আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব। এই মতে বিশ্বাসীরা গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে গভীর যোগাযোগে বিশ্বাস করত। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্ঞান মানুষের ভিতরেই থাকে এবং কোনো শাস্ত্রের বই পড়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিষ্কার মন এবং আত্মার উপর খুব জোর দেওয়া হতো। তাঁরা বলতেন যে, আত্মা শুদ্ধ হলে তবেই মানুষ নির্বাণ বা চিরমুক্তি লাভ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির বাইরে এই মতবাদগুলিতে উদার ধর্মীয় পথের খোঁজ পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া সিদ্ধাচার্যরা যেমন লুইপাদ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ প্রমুখ তাদের মত প্রচার করতেন স্থানীয় ভাষায়। পালযুগের শেষ দিক থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই ভাষায় *চর্যাপদ* লেখা শুরু করেছিলেন। চর্যাপদের মধ্য দিয়ে তখনকার বাংলার পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। এভাবে তাদের হাত ধরেই আদি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল।

টুকরো কথা

চর্যাপদ

চর্যাপদ হলো খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে লেখা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কবিতা ও গানের সংকলন। চর্যাপদে যে ভাষা রয়েছে তা হলো আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই চর্যাপদ-এর পুঁথি উদ্ধার করেন।

টুকরো কথা

নির্বাণ

বৌদ্ধ ধর্মমতে নির্বাণ (মুক্তি) লাভ করলে বারবার মানুষকে জন্মাতে হয় না।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) সমসাময়িক লেখক অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ বা মুক্তি বলতে কী বোঝানো হয় তা খুব সুন্দর একটা উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন তার শিখা নিভে যায়, জীবনে ক্লেশ বা দুঃখের অবসান হলে চিরতরে মুক্তি বা নির্বাণ মেলে। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্মের হীনযান শাখার।

মহাযানীদের ধারণা ছিলো যে নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো কিছুই নেই। পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধারণাগুলোতে অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী ছিল। তারা নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিত।

পাল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা এবং বিহারে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। পাল যুগের বাংলায় শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রাহ্মণদের থেকে বৌদ্ধ প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা বহু বই আজ হারিয়ে গেছে। তবে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদের কিছু-কিছু অস্তিত্ব জানা গেছে।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল আজকের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধবিহারগুলি। নালন্দা, ওদন্তপুরী (নালন্দার কাছে), বিক্রমশীল (ভাগলপুরের কাছে), সোমপুরী (রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে), জগদ্দল (উত্তরবঙ্গে), বিক্রমপুরী (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি বিহারগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। পালরাজাদের সমর্থনে ও বৌদ্ধ আচার্য এবং ছাত্রদের উৎসাহে এই বিহারগুলিসেকালের শিক্ষা-দীক্ষায় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। আচার্য ও ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালি। আচার্যদের মধ্যে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, কম্বলপাদ ও শবরীপাদ এবং দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ), গোরক্ষনাথ ও কাহ্নপাদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ বিহারগুলির মতো পড়াশোনার কেন্দ্র কি আজকাল দেখা যায়?

টুকরো কথা

নালন্দা

*সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটদের আমলে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আজকের বিহার রাজ্যে **নালন্দা বৌদ্ধবিহার** তৈরি হয়েছিল। কালে কালে সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার শিক্ষা-দীক্ষার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হর্ষবর্ধন এবং পাল রাজাদের আমলে নালন্দা শাসকদের সাহায্য পেয়েছিল। স্থানীয় রাজা এবং জমির মালিকরা তো বটেই, এমনকী সুদূর সুমাত্রা দ্বীপের শাসকও এই মহাবিহারের জন্য সম্পদ দান করেছেন। তা থেকে ছাত্রদের বিনা পয়সায় খাবার, জামাকাপড়, শয্যাদ্রব্য এবং ওষুধপত্র দেওয়া হতো। সুদূর তিব্বত, চিন, কোরিয়া এবং মোঙ্গলিয়া থেকে ছাত্ররা এখানে আসত পড়াশোনার জন্য। তার মধ্যে চিনদেশের ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ তহবিলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে এই বিহারে শিক্ষালাভ করেছেন। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্ররা এখানে পড়ার সুযোগ পেত। নালন্দার সমৃদ্ধির যুগে দশ হাজার জন আবাসিক ভিক্ষু এখানে থাকত। তার মধ্যে ১,৫০০ জন ছিল শিক্ষক এবং ৮,৫০০ জন ছিল ছাত্র। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এর খ্যাতি বজায় ছিল। ঐ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা বিহার অঞ্চল আক্রমণ করে এই মহাবিহারের ব্যাপক ক্ষতি করেছিল।*

ছবি ৩.১ : নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিহার

ছবি ৩.২ : বিক্রমশীল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, বিহার

টুকরো কথা

বিক্রমশীল

*পাল সম্রাট ধর্মপাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে মগধের উত্তর ভাগে গঙ্গার তীরে আধুনিক ভাগলপুর শহরের কাছে **বিক্রমশীল মহাবিহার** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী পাঁচশো বছর এটি টিকে ছিল। এই মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা এবং শিক্ষার জন্য একশোর বেশি আচার্য ছিলেন। সেখানে পড়াশোনার জন্য ছাত্ররা আসত। এখানে ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হতো। সর্বোচ্চ তিন হাজার ছাত্র এখানে পড়ত এবং বিনা খরচে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখানেও প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ভর্তি হতে হতো। শিক্ষা শেষে তাদের উপাধি প্রদান করা হতো। বিক্রমশীল ছিল বজ্রযান বৌদ্ধ মতচর্চার একটা বড়ো কেন্দ্র। এর গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) ছিলেন এই মহাবিহারের অন্যতম একজন মহাচার্য। এই মহাবিহারকেও ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা ধ্বংস করেছিল।*

তোমার খাতায় একটা শঙ্কু আকৃতির বৌদ্ধ স্তূপের ছবি আঁকো।

পালযুগের শিল্পরীতিকে প্রাচ্য শিল্পরীতি বলা হয়। এই রীতির পূর্বসূরী ছিল গুপ্তযুগের শিল্পকলা। পাল আমলের স্থাপত্যের মধ্যে ছিল স্তূপ, বিহার এবং মন্দির। তবে প্রকৃতির কোপে এবং মানুষের রোষে সেই স্থাপত্যের আর বিশেষ কিছু নেই।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈনদের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের রীতি ছিল। বিশেষ করে বৌদ্ধরা বহু স্তূপ তৈরি করেছিল। এগুলি প্রথমে দেখতে ছিল গোলাকার, পরে অনেকটা মোচার খোলার মতো শঙ্কু আকৃতির হয়ে পড়ে।

পাল রাজত্বে তৈরি স্তূপগুলো শিখরের মতো দেখতে ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আসরফপুর গ্রামে, রাজশাহীর পাহাড়পুরে, চট্টগ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ভরতপুর গ্রামে বৌদ্ধ স্তূপ পাওয়া গেছে। তবে স্তূপ নির্মাণে বাংলায় কোনো মৌলিক ভাবনার বিকাশ লক্ষ করা যায়নি। বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহার ছিল পাল আমলের উল্লেখযোগ্য বিহার। মন্দিরের মধ্যে সোমপুরী বিহারের মন্দির ছিল উল্লেখযোগ্য বিহার। চারকোণা এই মন্দিরে গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ পথ, মণ্ডপ, সুউচ্চ স্তম্ভ ইত্যাদি ছিল। মন্দির নির্মাণে স্থানীয় পোড়ামাটির ইট এবং কাদার গাঁথুনি ব্যবহার করা হয়েছিল।

ছবি ৩.৩ : বাংলার মূর্তি (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)। [(ক) সূর্য (খ্রিঃ ৭ম-৮ম শতক)] [(খ) মঞ্জুবজ্র মণ্ডল (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(গ) চণ্ডী (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(ঘ) মহিষাসুরমর্দিনী (খ্রিঃ ১২শ শতক)] [(ঙ) উমা-মহেশ্বর (খ্রিঃ ১২শ শতক)]

পাল আমলের ভাস্কর্যগুলি ঐ আমলের শিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাহাড়পুর প্রত্নক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো নির্দশন পাওয়া যায়। এখানে মূল মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলক রয়েছে যার মধ্যে স্থানীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট। ফলকগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম, শিব, বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। এই দেব-দেবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি। পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি উভয়ের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। ভাস্কর্যের মধ্যে পোড়ামাটির শিল্পসামগ্রীও ছিল। এগুলি ছিল স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতীক। এগুলিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, সমাজজীবন, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি ফুটে উঠেছে।

খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে আঁকা কোনো ছবি আজ আর পাওয়া যায় না। যে ছবিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলো বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপি অলংকরণ করার জন্য আঁকা হয়েছিল। এই ছবিগুলি আকারে ছোটো কিন্তু এগুলি পরের যুগের অণুচিত্রের (মিনিয়েচার) মতো সূক্ষ্ম রেখাময় নয়। বরং এগুলির সঙ্গে প্রাচীরগাত্রে আঁকা ছবির মিল আছে।

ছবি ৩.৪ : পালযুগে লেখা অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুথির একটি পাতার আঁকা ছবি

পাল যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বরেন্দ্রভূমির ধীমান এবং তাঁর ছেলে বীটপাল ছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী। তাঁরা ধাতব শিল্পে, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

সেন রাজাদের আমলে স্থানীয় গ্রাম শাসনব্যবস্থায় অবনতি ঘটেছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ শিথিল হয়ে এসেছিল। রাষ্ট্র অসংখ্য ছোটো-ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেন আমলের লেখগুলোতে রাজ্ঞী বা রাজমহিষীদের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, রাজপরিবারের মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছিল।

সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল মোটামুটি সচ্ছল। তবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এর প্রমাণ আছে সে যুগের সাহিত্যে। পাল আমলের তুলনায় সেন আমলে বর্ণব্যবস্থা কঠোর, অনমনীয় হয়ে পড়েছিল।

পাল যুগের মতো সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটেনি। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এই দুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য, বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা, মাতৃকা, শিব, বিষ্ণুর পুজো করা হতো। সেন রাজাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণব, তবে তার পূর্বসূরীরা ছিলেন শৈব।

বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও বৌদ্ধরা আগেকার যুগের মতো সুযোগ-সুবিধা পেত না। ব্রাহ্মণরাই সমাজপতি হিসাবে সুবিধা ভোগ করত। আবার, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ ছিল। অ-ব্রাহ্মণদের সবাইকে 'সংকর' বা 'শূদ্র' হিসাবে ধরা হতো। ব্রাহ্মণরা অ-ব্রাহ্মণদের কাজ করতে পারত, কিন্তু অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের কাজগুলি করতে পারত না। এ ছাড়া, সেন আমলে আদিবাসী-উপজাতি মানুষদের কথাও জানা যায়।

সেন যুগে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর *গীতগোবিন্দম্* কাব্যের বিষয় ছিলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার আর এক কবি ধোয়ী লিখেছিলেন *পবনদূত* কাব্য। এ যুগের আরো তিনজন কবি ছিলেন গোবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ। এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে।

সেন যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মী কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে সাহিত্যেরও যোগ ছিল। রাজা বল্লালসেন এবং রাজা লক্ষ্মণসেন দুজনেই স্মৃতিশাস্ত্র লিখেছিলেন। বল্লালসেনের লেখা চারটে বইয়ের মধ্যে *দানসাগর* এবং *অদ্ভুতসাগর* বই দুটি পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ বৈদিক নিয়ম বিষয়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামে একটা বই লিখেছিলেন। অভিধানপ্রণেতা সর্বানন্দ এবং গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ শ্রীনিবাস ছিলেন সেন যুগের আরো দুজন লেখক।

টুকরো কথা

সাহিত্য ও সমাজ

সাহিত্য হলো সমাজের আয়না। একদিকে রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্যে ধনী ও বিলাসী জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল। রাজা লক্ষ্মণসেনকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে কবিরা স্তুতি করেছেন। আবার, গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের জীবনযাত্রার ছবি ফুটেছে এই রকম একটি রচনায় : বর্ষার জল পেয়ে চমৎকার ধান গজিয়েছে, গোরুগুলো ঘরে ফিরে এসেছে, খেতে ভালো আখ হয়েছে, আর কোনো ভাবনা নেই।

অন্যদিকে, গরিব মানুষের জীবনেরও ছায়া পড়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। খিদেয় কাতর শিশু, গরিব লোকের ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাপড় এই সব দৃশ্য ব্যবহার করেছেন কবিরা। বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের বাসিন্দা গরিব মানুষের জীবনের কষ্ট ধরা পড়েছে এই রকম একটি লেখায় : কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচো খুঁজতে আসা ব্যাঙে আমার ভাঙা ঘর ভরে গেছে। চর্যাপদের একটি কবিতায় আছে— 'হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস'। এটাই চরম দারিদ্র্যের নিদর্শন।

টুকরো কথা

ডাক ও খনার বচন

প্রাচীন বাংলার সমাজে কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ডাক ও খনার বচন-এর ছড়াগুলো তারই প্রমাণ। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই বচন বা ছড়াগুলি চলত। কোন ঋতুতে কী ফসল বুনতে হবে, কোন ফসলের জন্য কেমন মাটি দরকার, কতটা বৃষ্টির দরকার— এসব নানা কিছুর হদিস এই ছড়াগুলিতে আছে। যেমন :

ক) মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল।

খ) খনা ডেকে ব'লে যান। রোদে ধান ছায়ায় পান।

গ) খনা বলে চাষার পো (ছেলে)। শরতের শেষে সরিষা রো।

ঘ) দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল।

ঙ) অগ্রহায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁটালের সৃষ্টি।

এমন আরো অনেক বচন আছে। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় এগুলো লেখা। তারা এই ছড়াগুলো থেকেই নানা দরকারি জ্ঞান পেত।

এবারে বাংলায় পাল এবং সেন শাসনকালের সংক্ষেপে তুলনা করা যেতে পারে। চারশো বছরেরও বেশি স্থায়ী পাল শাসন বাংলার সমাজে যেভাবে শেকড় গেড়েছিল, একশো বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী সেন শাসন তা পারে নি। গোপাল যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তাঁর পিছনে জনসমর্থন ছিল। বিজয়সেন এমন কোনো জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেননি। পাল শাসকরা যেভাবে বাংলার সমাজে নিজেদের শাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন, সেন শাসকরা তা পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্মচর্চায়, শিল্পকলায় পাল যুগ অনেক এগিয়ে ছিল।

ছবি ৩.৫ :
পালযুগের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি অবলম্বনে আঁকা ছবি

সেন যুগের সাহিত্য থেকে সেই সময়ের বাংলার যে দুরকম ছবি পাওয়া গেছে, এর থেকে সেযুগের সমাজ কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩.৩ ভারত ও বহির্বিশ্ব : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির লেনদেন এবং সংঘাত দেখা যায়। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নমুনা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, তিব্বত এবং চিন প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। বোঝা যায় নানারকম সংস্কৃতির মেলামেশায় ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন গড়ে উঠেছিল। সেই জীবনযাপন স্থির ছিল না, প্রয়োজনে নিজেকে বদল করেছিল। ফলে আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান বৈচিত্র্যময় স্থানীয় মানুষদের দেখতে পাবে। এই বৈচিত্র্যগুলি ভালোভাবে বুঝে সেগুলি টিকিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ইসলামীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আসার ফলে ভারতের জ্ঞানচর্চার লাভ হয়েছিল বেশি। দুই সংস্কৃতির মেলামেশার ছাপ পড়েছিল সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি থেকে প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। এই বোঝাপড়া একমুখী ছিল না। উভয় উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। কখনো কখনো সংঘাতও বেঁধেছিল। তবে অনেকদিনের মেলামেশায় আস্তে আস্তে মিশে যায় দুটি ধারাই।

ছবি ৩.৬ : তিব্বতের একটি বৌদ্ধ গুম্ফায় আঁকা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)-এর প্রতিকৃতি (আনুমানিক ১১০০খ্রিঃ)। বাঁহাতে একটি তালপাতার পুঁথি ধরে অতীশ তাঁর ছাত্রদের পড়াচ্ছেন।

টুকরো কথা

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)

ভারত এবং বহির্ভারতের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অন্যতম উদাহরণ হলেন দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। বাঙালি বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অতীশের (আনুমানিক ৯৮০-১০৫৩ খ্রিঃ) জন্ম বঙ্গাল অঞ্চলের বিক্রমণিপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তিনি ব্রাহ্মণ্য মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তাঁর বাড়ি আজও 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিত। ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। তিনি সম্ভবত বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী এবং সোমপুরী মহাবিহারের আচার্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভের

অনুরোধে তিনি দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে যান (১০৪০ খ্রিস্টাব্দ)। সেখানে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁরই চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর মূল সংস্কৃত লেখাগুলি না পাওয়া গেলেও তিব্বতি ভাষায় অনুবাদগুলি পাওয়া যায়। অতীশ তিব্বতে বুদ্ধের অবতার হিসাবে পূজিত হন। তিব্বতের রাজধানী লাসার কাছে তাঁর সমাধিস্থান পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সমগ্র বাংলা-বিহারের ওপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। তাই এদেশের বৌদ্ধ আচার্যরা মনে করেছিলেন যে তিনি তিব্বতে চলে গেলে ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অনেক পরে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই অসীম প্রতিভাধর আচার্য সম্পর্কে লিখেছেন 'বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর, জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর'।

এই সময়ে ভারতীয় শিল্প, ভাষা এবং সাহিত্যের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় রামায়ণের ঘটনাবলি নিয়ে নৃত্য-সংগীত খুবই জনপ্রিয় ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার বোরোবোদুরের বৌদ্ধ মন্দির সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে কম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাটে বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির তৈরি হয়। পরে এখানে বৌদ্ধরাও উপাসনা করত। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন গল্প গাথা খোদাই করা হয়েছে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক একমুখী ছিল, সেটা ভাবা উচিত নয়। পানপাতা ও অন্যান্য বেশ কিছু ফসল কীভাবে ফলাতে হয় তা এইসব প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে ভারত শিখেছিল। এই সব দেশগুলির শিল্প, ধর্ম, লিপি এবং ভাষার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক প্রভাব ছিল। কিন্তু সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতি তার নিজস্ব মেজাজ বজায় রেখেছিল। তার মধ্যে স্থানীয় উপাদানের সাথে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ছোঁয়াও লেগেছিল।

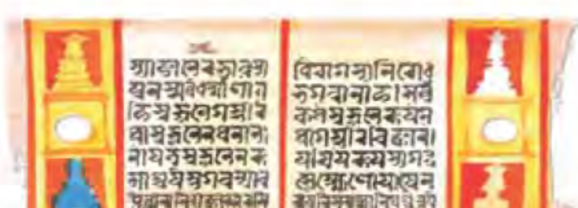

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও: **পূর্ণমান ১**

(ক) নাড্ডু, চোল, উর, নগরম।

(খ) ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, নালন্দা, জগদ্দল, লখনৌতি।

(গ) জয়দেব, ধীমান, বীটপাল, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণিদত্ত।

(ঘ) লুইপাদ, অশ্বঘোষ, সরহপাদ, কাহ্নপাদ।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়? **পূর্ণমান ১**

(ক) বিবৃতি : বাংলার অর্থনীতি পাল-সেন যুগে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : পাল-সেন যুগে বাংলার মাটি আগের যুগের থেকে বেশি উর্বর হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-২ : পাল-সেন যুগে ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : পাল-সেন যুগে রাজারা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের উপর কর নিতেন।

(খ) বিবৃতি : দক্ষিণ ভারতে মন্দির ঘিরে লোকালয় ও বসবাস তৈরি হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : রাজা ও অভিজাতরা মন্দিরকে নিষ্কর জমি দান করতেন।

ব্যাখ্যা-২ : নদী থেকে খাল কেটে সেচব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : দক্ষিণ ভারতে রাজারা অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন।

(গ) বিবৃতি : সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার কমে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : সেন রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন।

ব্যাখ্যা-৩ : সমাজে শূদ্রদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৩**

(ক) দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি কেন ঘটেছিল?

(খ) পাল ও সেন যুগে বাংলায় কী কী ফসল উৎপন্ন হতো? সেই ফসলগুলির কোন কোনটি এখনও চাষ করা হয়?

(গ) রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সাহিত্যচর্চার পরিচয় দাও।

(ঘ) পাল শাসনের তুলনায় সেন শাসন কেন বাংলায় কম দিন স্থায়ী হয়েছিল?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো : **পূর্ণমান ৫**

(ক) ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার ছবি আঁকতে গেলে কেন তা একখানা ত্রিভুজের মতো দেখায়? এই ব্যবস্থায় সামন্তরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত?

(খ) পাল ও সেন যুগের বাংলার বাণিজ্য ও কৃষির মধ্যে তুলনা করো।

(গ) পাল আমলের বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো।

(ঘ) পাল ও সেন যুগে সমাজ ও ধর্মের পরিচয় দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি খ্রিস্টীয় দশম শতকের বাংলার একজন কৃষক হও, তাহলে তোমার সারাদিন কেমন ভাবে কাটবে তা লেখো।

(খ) মনে করো তুমি বিক্রমশীল মহাবিহারের একজন ছাত্র। তোমার শিক্ষক দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বতে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তুমি কী কথা বলবে? তিনিই বা তোমাকে কী বলবেন? এই নিয়ে একটি কাল্পনিক কথোপকথন লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

দিল্লি সুলতানি

তুর্কো-আফগান শাসন

৪.১ সুলতান কে?

মহম্মদ ঘুরি মারা গেলে (১২০৬ খ্রিঃ) তাঁর জয় করা অঞ্চলগুলি ভাগ হয়ে যায় তার চারজন অনুচরের মধ্যে। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পেলেন গজনির অধিকার। নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান ও উছ্-এর শাসক হয়ে বসলেন। বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশের শাসক হন। আর লাহোর ও দিল্লির অধিকার থাকে কুতুবউদ্দিন আইবকের হাতে।

দিল্লিকে কেন্দ্র করে আইবক সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। *সুলতান* একটা উপাধি। তুর্কি শাসকরা অনেকেই ঐ উপাধি ব্যবহার করতেন। আদতে আরবি ভাষায় সুলতান শব্দের মানে কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এইসব। যে অঞ্চলের মধ্যে সুলতানের কর্তৃত্ব চলত, তাকে বলা হয় *সুলতানৎ* বা সুলতানি। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে সুলতানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল। তাই তার নাম দিল্লি সুলতানি বা *সুলতানৎ*।

৪.২ খলিফা ও সুলতানের সম্পর্ক

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর থেকে ইসলামীয় জগতে প্রধান শাসক ছিলেন খলিফা। ইসলামের আওতায় যত অঞ্চল ছিল, তার মূল শাসক তিনিই। খলিফা আবার ধর্মগুরুও বটে। (এ বিষয়ে তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২০নং পৃষ্ঠাতে পড়েছো) ফলে, দিল্লির সুলতানির উপরেও আদতে খলিফারই অধিকার ছিল।

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের কর্তৃত্ব ছিল বিশাল অঞ্চলে। একজন খলিফার পক্ষে সমস্ত অঞ্চলে শাসন করা সম্ভবই ছিল না। তাই খলিফার থেকে অনুমোদন নিয়ে নানান অঞ্চলে নানান ব্যক্তি শাসন করতেন। তেমনই ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানে শাসক ছিলেন সুলতান। কিন্তু, এমনিতে সুলতানরা খলিফাকে যে খুব মেনে চলতেন, তা নয়। তবে মাঝেমধ্যেই কে সুলতান হবেন, এই নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে উঠত। ধরা যাক, কোনো তুর্কি সেনাপতি অনেক অঞ্চল জয় করেছেন। সেই অঞ্চলটি তিনি নিজেই শাসন করতে চান। তখন ঐ সেনাপতি খলিফার কাছে উপহার পাঠিয়ে সুলতান হওয়ার আরজি জানাতেন। তার মানে খলিফার অনুমোদনের অত্যন্ত সম্মান ছিল। সেই অনুমোদনকে বাকিরা নাকচ করতে পারত না। তেমনই একটি গোলমাল

টুকরো কথা

শাসকের উপাধি

রাজা, সম্রাট, সুলতান এইসব শব্দগুলিই শাসকের উপাধি। শাসকের ধর্ম ও দেশ এবং শাসনের ক্ষমতার হেরফেরে উপাধিগুলির ব্যবহার বদলে যেত। যেমন, রাজা হলেন রাজ্যের শাসক। রাজা কথাটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। তাই ভারতবর্ষে অ-মুসলমান শাসকদের রাজা বলা হতো। আবার যে রাজা অনেক রাজ্য জয় করে বিরাট অঞ্চলের শাসক হয়েছেন, তিনি সম্রাট। সাম্রাজ্যের শাসক তিনি। সাম্রাজ্য একটি বিরাট অঞ্চল। তার সব দেখভাল সম্রাটের দায়িত্ব। একটি সাম্রাজ্যের ভেতরে রাজ্য থাকতেও পারে। রাজা সম্রাটের চেয়ে সম্মান ও ক্ষমতায় ছোটো।

সুলতানরা ছিলেন তুর্কি। সেজন্যই রাজা বা সম্রাট উপাধি না নিয়ে, সুলতান উপাধি নিলেন। তাই কুতুবউদ্দিন আইবককে সুলতান বলা হয়।

পাকিয়ে উঠল দিল্লির সুলতানিতেও। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনির শাসক হিসাবে দিল্লির উপরেও অধিকার কায়েম করতে চাইলেন। কুতুবউদ্দিন তাতে রাজি হলেন না। গজনির সঙ্গে দিল্লির সব সম্পর্ক বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, কুতুবউদ্দিনের জামাই ইলতুৎমিশ যখন সুলতান হলেন **(৪.৩ একক দেখো)**, তখনই গোলমাল জটিল হয়ে উঠল। একে তো ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দিনের জামাই, ছেলে নন। তার উপরে, নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান থেকে এসে লাহোর ও পাঞ্জাবের খানিক অংশ দখল করে নিলেন। অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষমতাবান তুর্কিরা (*আমির* বলা হতো এদের) কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। ফলে ইলতুৎমিশ পড়লেন বিপদে। কেউই তাঁকে দিল্লির সুলতান বলে মানতে চায় না। তারা তার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তখন ইলতুৎমিশ দিল্লির সুলতানিতে নিজের অধিকার বজায় রাখতে খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। খলিফার কাছে নানান উপহার পাঠান। তার বদলে বাগদাদের খলিফা ইলতুৎমিশকে *দুরবাশ* ও *খিলাত* পাঠান, এবং দিল্লির সুলতানিতে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্বকে অনুমোদন দেন।

টুকরো কথা

খলিফার অনুমোদন

ইলতুৎমিশ খলিফার থেকে অনুমোদন পান ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে। সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় নিজেদের 'খলিফার প্রতিনিধি' বলে খোদাই করাতেন। প্রতি শুক্রবারে নামাজে খলিফার নাম বলতেন। মহম্মদ বিন তুঘলক প্রথমে তাঁর আমলের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করা বন্ধ করে দেন। তবে পরে ঘন ঘন বিদ্রোহে জেরবার হয়ে তিনি আবার নিজের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করার আদেশ দেন। খলিফার থেকে অনুমোদন পত্রও আনিয়ে নেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকও দু-বার খলিফার অনুমোদন পান। এরপর থেকে অবশ্য ভারতে খলিফার থেকে অনুমোদন চাওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। আর মুঘল বাদশাহরা ভারতের বাইরের কাউকে মর্যাদা ও ক্ষমতায় নিজেদের সমান বলে মনেই করতেন না।

এভাবে যখনই শাসন ও অধিকারের নায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত, তখনই দিল্লির সুলতানরা খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে তার অনুমোদন চাইতেন। তবে, কাজের দিক থেকে দিল্লির সুলতানরা প্রায় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। খলিফারা কেউই দূর হিন্দুস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতেন না। এভাবেই দিল্লির সুলতানি নিজের মতো করে ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্তানে প্রায় তিনশো কুড়ি বছর শাসন জারি রাখতে পেরেছিল।

টুকরো কথা

খুতবা

খুতবা কথাটির আসল মানে হল ভাষণ। কোনো সুলতানের শাসনকালে মসজিদের ইমাম একটি ভাষণ পড়তেন। শুক্রবারের দুপুরের নামাজের (জোহরের নামাজ) পরে সবার সামনে ঐ ভাষণ বা খুতবাটি পাঠ করা হতো। তাতে সমকালীন খলিফা ও সুলতানের নামের উল্লেখ থাকত। এর মধ্যে দিয়ে সুলতান যে নিয়ম মেনে শাসক হয়েছেন সেটা বারবার জানান দেওয়া হতো।

কথার মানে

আমির : *উঁচু বংশে জন্ম, বড়োলোক ব্যক্তি। তবে দিল্লির সুলতানির ইতিহাসে শাসনকাজে নিযুক্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমির বলা হতো। আমির শব্দেরই বহুবচন হলো ওমরাহ (আমিরগণ)।*

দুরবাশ : *স্বাধীন শাসনের প্রতীক দণ্ড।*

খিলাত : *আনুষ্ঠানিক পোশাক।*

৪.৩ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগ

কুতুবউদ্দিন আইবকের (১২০৬-'১০ খ্রিঃ) সময়ে দিল্লিতে তুর্কি শাসন স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। মামেলুক (দাস বংশ) সুলতানরা ছিলেন ইলবারি তুর্কি। ইলতুৎমিশের (১২১১-'৩৬ খ্রিঃ) সময়ে দিল্লি সুলতানির সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা ছিল। প্রথমত, কীভাবে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহী শক্তিকে দমন করা যাবে? দ্বিতীয়ত, কীভাবে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গল শক্তিকে মোকাবিলা করা যাবে? এবং তৃতীয়ত, কীভাবে সুলতানিতে একটি রাজবংশ তৈরি করা যাবে, যাতে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরাধিকারী গোলমাল ছাড়াই সিংহাসনে বসতে পারে? ইলতুৎমিশ ক্রমাগত যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি কৌশল করে মোঙ্গলদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করার সম্ভাবনা এড়িয়ে যান (**৪.৭.১ একক দেখো**)। এ ছাড়া তিনি একটি রাজবংশ তৈরি করে যেতে পেরেছিলেন। দিল্লির জনসাধারণের মনে তিনি বংশগত শাসনের একটি ধারণা তৈরি করতে পেরেছিলেন। তাঁর বংশের শাসকরা তাঁর মৃত্যুর পরেও তিরিশ বছর শাসন করেছিল।

ইলতুৎমিশের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। তাঁর শাসনকাল (১২৩৬-'৪০ খ্রিঃ) দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে দু-ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। প্রথমত, এই প্রথম ও শেষবার একজন নারী দিল্লির মসনদে বসেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সুলতান ও তুর্কি অভিজাত অর্থাৎ *চিহলগানি*-র সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করেছিল।

ইলতুৎমিশের সন্তানদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন যোগ্যতম। একজন নারীর সিংহাসনে বসা নিয়ে অভিজাতদের এক অংশ আপত্তি করেছিল। ইলতুৎমিশের এক ছেলে অল্প দিনের জন্য শাসক হলেও শেষ পর্যন্ত রাজিয়াই ইলতুৎমিশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন।

রাজিয়া সিংহাসনে বসেছিলেন সেনাবাহিনী, অভিজাতদের একাংশ ও দিল্লির সাধারণ লোকেদের সমর্থন নিয়ে। উলেমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া অ-মুসলিমদের ওপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নিয়েছিলেন।

অন্য দিকে, তুর্কি অভিজাতরা মনে করেছিল যে রাজিয়া অ-তুর্কি অভিজাতদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর ফলে দিল্লির বাইরে যেসব তুর্কি অভিজাতরা ছিল তারা গোড়া থেকেই রাজিয়ার বিরোধিতা করতে শুরু করে।

দেশের শাসন চালিয়েছেন এমন আরো কয়েকজন নারী-শাসকের নাম খুঁজে দেখোতো। দরকারে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

টুকরো কথা

সুলতান রাজিয়া

রাজিয়া একজন নারী হলেও তাঁর উপাধি সুলতান, সুলতানা নয়। আরবি ভাষায় সুলতানা শব্দের অর্থ হলো সুলতানের স্ত্রী। কিন্তু, রাজিয়া কোনো সুলতানের স্ত্রী ছিলেন না। রাজিয়া তাঁর মুদ্রায় নিজেকে সুলতান বলে দাবি করেছেন। ওই যুগের একজন ঐতিহাসিক মিনহাজ - ই সিরাজ রাজিয়াকে সুলতান বলেই উল্লেখ করেছেন।

টুকরো কথা

তুর্কান-ই চিহলগানি বা বান্দেগান-ই চিহলগানি

তুর্কান-ই চিহলগানি কথার আক্ষরিক মানে হলো চল্লিশ জন তুর্কি বা চল্লিশটি তুর্কি পরিবার। এরা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল।

বন্দেগান-ই চিহলগানি কথার মানে হলো চল্লিশ জন বান্দা। বান্দা মানে সেবক বা অনুগামী। এই দুটি কথা দিয়েই ইলতুৎমিশের অনুগত যোদ্ধাদের বোঝানো হতো। নামে তুর্কি হলেও এদের সবাই জাতিগতভাবে তুর্কি ছিল না। সংখ্যার দিক থেকেও তারা চল্লিশ জনের অনেক বেশি ছিল। এরাই ছিল ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ। এদের মধ্যে থেকেই গিয়াসউদ্দিন বলবন পরে সুলতান হয়েছিলেন।

মানচিত্র ৪.১ :

দিল্লি সুলতানি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

এ ছাড়া রাজপুত শক্তিও তাঁর শাসনের বিরোধী ছিল। রাজিয়া কিছু বিদ্রোহ দমন করলেও মাত্র সাড়ে তিন বছরের বেশি তাঁর শাসন টেকেনি।

৪.৪ সুলতানির বিস্তার ও স্থায়িত্ব দান : গিয়াসউদ্দিন বলবন

১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান রাজিয়ার মৃত্যু হয়। এরপর কয়েক বছর দিল্লির তুর্কি অভিজাতদের সঙ্গে সুলতান ইলতুৎমিশের বংশধরদের ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছিল। ইলতুৎমিশের ছেলে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১২৪৬-'৬৬খ্রিঃ) একজন তুর্কি আমির ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নাম গিয়াসউদ্দিন বলবন। ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই সুলতান হন। ইলতুৎমিশের বংশের শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। এরপর থেকে বলবন ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা আরো প্রায় সাড়ে তিন দশক শাসন করেছিলেন।

বলবন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ের দিল্লি সুলতানির প্রধান সমস্যা ছিল ভিতরের বিদ্রোহ। বলবন কঠোর হাতে সেগুলিকে দমন করেছিলেন। রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি দরবারে সিজদা ও পাইবস প্রথা চালু করেছিলেন। অভিজাতদের থেকে সুলতানের ক্ষমতা যে বেশি তা বোঝানোর জন্য প্রথাগুলি চালু করা হয়েছিল।

দিল্লি সুলতানিতে যখন এই সব ঘটনা ঘটছে সে সময়টা ছিল ত্রয়োদশ শতক। এই শতকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়। সুলতানরা বন কেটে ফেলে, শিকারি ও পশুপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ঐ এলাকাতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মজবুত করেছিলেন। তাঁরা কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করেন। তৈরি হয় নতুন নতুন শহর ও দুর্গ।

সুলতানি ও উত্তরাধিকার

সুলতানির প্রধান শাসক হলেন সুলতান। কিন্তু একজন সুলতান মারা গেলে তার পরে কে সিংহাসনে বসবে তা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা দেখা দিত। ইলতুৎমিশের (মৃত্যু ১২৩৬খ্রিঃ) পর থেকে আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনে বসার সময়ের (১২৯৬খ্রিঃ) মধ্যে কেটে গিয়েছিল ষাট বছর। এই ষাট বছরে দশ জন সুলতান দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। উত্তরাধিকারের কোনো সাধারণ নিয়মনীতি এই সময় ছিল না। এর ফলে ঘন ঘন শাসক বদল হয়েছে। শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে থেকেছে। বর্তমান সুলতানের সন্তান বা বংশধর পরবর্তী সুলতান হবেন কি না তার কোনো ঠিক ছিল না। অভিজাতরা বিদ্রোহ করে আগের সুলতানের বংশধরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শাসক হয়ে বসেছে। ত্রয়োদশ শতকের দিল্লি সুলতানিতে এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

৪.৫ দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার : আলাউদ্দিন খলজি

প্রথম দিকের তুর্কি সুলতানদের শাসনকালে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়েছিল। এরপর সুলতানরা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তারে মন দেন। আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির প্রথম সুলতান যিনি দক্ষিণ ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর। **(৪.২ মানচিত্র দেখো)**

টুকরো কথা

সিজদা ও পাইবস

এ দুটি ছিল পারসিক প্রথা। বলবন নিজেকে পারস্যের কিংবদন্তী নায়কের বংশধর ভাবতেন। রাজদরবারে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পালন করতেন। সিজদা-র অর্থ হলো সুলতানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা। আর সুলতানের পদযুগল চুম্বন করাকে বলা হতো পাইবস। এগুলো ছিল সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক।

টুকরো কথা

খলজি বিপ্লব

১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খলজি বলবনের বংশধরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান হন। এই ঘটনাকে 'খলজি বিপ্লব' বলা হয়। এর ফলে দিল্লিতে ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা চলে যায়। তার বদলে খলজি তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।

এবারে ভেবে বলোতো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশাল এলাকা কী ভাবে সুলতানরা শাসন করবেন? এই বিষয়ে জানার জন্য পড়ে দেখো 'সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ' অংশটি *(৪.৭.১ থেকে ৪.৭.৩ এককগুলি দেখো)*।

মানচিত্র ৪.২ : আলাউদ্দিন খলজির সামরিক অভিযান

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

উপরের মানচিত্রে কতগুলো স্থানের নাম খুঁজে পেলে? এর মধ্যে কোন কোন স্থানের নাম বর্তমানেও একই আছে তা আজকের ভারতের মানচিত্র দেখে মেলাও। প্রয়োজনে তোমার শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।

৪.৬ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর খলজি সুলতানরা দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। এরপর তুঘলক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বড়ো ছেলে মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল (১৩২৪-'৫১খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো দেশের তাঞ্জিয়ার শহরের অধিবাসী ইবন বতুতা এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ বিবরণীর নাম *অল-রিহলা*। মহম্মদ বিন তুঘলকের যুগ সম্পর্কে এই গ্রন্থ একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র।

টুকরো কথা

ইবন বতুতার বিবরণে ভারত

ইবন বতুতার লেখা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ

"ভারতে ডাকে চিঠিপত্র পাঠাবার দু-রকম ব্যবস্থা আছে। ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থাকে 'উলাক' বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি চার মাইল অন্তর ডাকের ঘোড়া রাখা হয়। পায়ে হাঁটা যে-ডাকের ব্যবস্থা আছে তাকে বলা হয় 'দাওআ'। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মাইলের এক-তৃতীয়াংশে ঘনবসতির একটি গ্রাম থাকে। গ্রামের বাইরে তিনটি তাঁবু থাকে। এই তাঁবুতে ডাকের লোকেরা কোমর বেঁধে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এদের প্রত্যেকের হাতে থাকে দু-হাত লম্বা একটি লাঠি। প্রত্যেক লাঠির মাথায় কয়েকটি তামার ঘণ্টা বাঁধা থাকে। যখন শহর থেকে সংবাদবাহক রওনা হয় তখন তার এক হাতে থাকে চিঠি আর অন্য হাতে থাকে ঘণ্টা-বাঁধা লাঠিটি। এই চিঠি ও লাঠি নিয়ে সে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়োতে থাকে। .... দেশে নতুন লোকের আগমন-সংবাদ গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা চিঠি লিখে সুলতানকে জানিয়ে দেয়। সে-চিঠিতে নবাগতের নাম, তার দেহের ও পোশাকাদির বর্ণনা, সঙ্গীদের সংখ্যা, চাকর-বাকর, ঘোড়া ইত্যাদির বিবরণ থাকে। পথে চলার সময় অথবা বিশ্রামের সময় তাদের ব্যবহার কী রকম তা-ও জানানো হয় চিঠিতে।"

মানচিত্র ৪.৩ : ইবন বতুতার ভারত ভ্রমণ

টুকরো কথা

তুঘলকি কাণ্ডকারখানা

আজকের দিনেও কোনো ব্যক্তির খামখেয়ালি আচরণকে বলা হয় তুঘলকি কাণ্ডকারখানা। কারণ মহম্মদ বিন তুঘলককে কেউ কেউ বলেছেন 'পাগলা রাজা'। আর তাঁর কাজকর্মকে বলা হয়েছে তুঘলকি কাণ্ড।

তুমিও কি তাই বলবে? **নীচের অংশটা পড়ে নিজে ভাবো :**

- বাড়তি কর সংগ্রহ করার জন্য দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুলতান। অনাবৃষ্টির ফলে সেখানে শস্যের ক্ষতি হয়েছিল। প্রজারা বাড়তি কর দিতে পারেনি। তারা বিদ্রোহ করে। সুলতান বাড়তি কর মকুব করেন। নষ্ট হওয়া ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ দেন। কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সুলতান *তকাভি* ঋণ দান প্রকল্প চালু করেছিলেন।
- দিল্লির অধিবাসীদের বিরোধিতা এবং মোঙ্গল আক্রমণের ভয় থেকে রক্ষা পেতে ও দাক্ষিণাত্যকে শাসন করতে দেবগিরিতে দ্বিতীয় রাজধানী তৈরি করেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ওই শহরের নতুন নাম হয় দৌলতাবাদ। সুলতানের হুকুমে দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে যেতে গিয়ে পথে অনেক মানুষ প্রাণ হারান। কয়েক বছর পরে সুলতান আবার রাজধানী ফিরিয়ে নিয়ে যান দিল্লিতে।
- মূল্যবান ধাতু সোনা এবং রুপোর ঘাটতি মেটাতে তামার মুদ্রা চালু করেন সুলতান। ওই মুদ্রা যাতে

মানচিত্র ৪.৪ : ভারত (আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রিঃ)

জাল না করা যায় তার জন্য আগে থেকেই তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। অনেকে তামার মুদ্রা জাল করে। বাজার থেকে জাল মুদ্রা তুলে নিতে রাজকোষ থেকে অনেক সোনা ও রুপোর মুদ্রা ব্যয় করতে বাধ্য হন সুলতান।

- মহম্মদ বিন তুঘলক কয়েকজন অনভিজাত, সাধারণ ব্যক্তিকে প্রশাসনে উঁচু পদে বসিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন মদ তৈরি করতেন, একজন ছিলেন নাপিত, একজন ছিলেন পাচক ও দু-জন ছিলেন মালি। তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুলতান এভাবে সাধারণ হিন্দুস্তানিদের ওপর নির্ভরতা দেখিয়েছিলেন।

- মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজকর্মের মধ্যে কোন কোন দিক ঠিক ছিল বলে তুমি মনে করো?
- তুমি কি মনে করো যে সুলতান কিছু ভুল করেছিলেন? কী কী ভুল করেছিলেন বলে তুমি মনে করো?
- তুমি যদি ওই যুগে নতুন রাজধানী তৈরি করতে তা হলে কেমন অঞ্চল বাছতে ও কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে?
- দেশের মুদ্রা জাল হলে কী কী অসুবিধা হতে পারে বলে তুমি মনে করো?
- মহম্মদ বিন তুঘলক প্রায় সাতশো বছর আগে শাসন করতেন। এতবছর পরেও তাঁর কাজকর্মের থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
- তোমার শ্রেণির বন্ধুদের মধ্যে ছোটো ছোটো দল করে নাও। এবারে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের কাজকর্মের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে বন্ধুদের মধ্যে বিতর্ক জমিয়ে তোলো।

ছবি ৪.১ : দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মহারাষ্ট্র।

মহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরসূরি ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-'৮৮খ্রিঃ) শাসনকালে একদিকে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তেমনি বেশ কিছু জনকল্যাণের সংস্কারও করা হয়েছে। ক্রমাগত যুদ্ধ করেও তিনি সুলতানি শাসনের বাইরে চলে যাওয়া এলাকাগুলোর ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর থেকে মনে হয় যে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে তত দক্ষ ছিলেন না।

টুকরো কথা

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযান

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযানের একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল দাস জোগাড় করা। ফিরোজ শাহের ১,৮০,০০০ দাস ছিল। তাদের জন্য একটা আলাদা দপ্তর খোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীতে, কারখানায়, বিভিন্ন দপ্তরে দাসরা নিযুক্ত হতো ও বেতন পেত। এভাবে সুলতান একটি অনুগত বাহিনী বানাতে চেয়েছিলেন।

মানচিত্র ৪.৫ : খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষ

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

সৈয়দ এবং লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪১৪-১৫২৬খ্রিঃ) দিল্লি সুলতানির আকার অনেক ছোটো হয়ে এসেছিল। জৌনপুর, গুজরাট, মালওয়া ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজপুতানার মেওয়াড় ও আলওয়াড় ও দোয়াবের হিন্দু শাসকরা সুলতানি শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এছাড়া ছিল স্বাধীন রাজ্য কাশ্মীর।

তবে সুলতান বহলোল লোদির শাসনকালে (১৪৫১-'৮৯খ্রিঃ) জৌনপুর রাজ্য দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আফগান সুলতানদের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই সময়ে রাজতন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান (১৪১৪-'২১খ্রিঃ) নিজে কখনো সুলতান উপাধি নেননি। তিনি একদিকে তুর্কো-মোঙ্গল শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি পূর্ববর্তী তুঘলক শাসকদের নাম খোদাই করা মুদ্রা তাঁর রাজ্যে চালু রেখেছিলেন। মধ্যযুগের ভারতে এই রকম ঘটনা আগে বা পরে কখনো ঘটেনি।

লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪৫১-১৫২৬খ্রিঃ) সুলতানের ক্ষমতা খানিকটা বেড়েছিল। সুলতান বহলোল লোদি আফগানদের সাবেকি রীতি মেনে অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে আসন ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু লোদি আফগানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পাশের জৌনপুর রাজ্য দখল করা ছিল তারই নমুনা। পরবর্তী শাসক সিকান্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭খ্রিঃ) অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে বহলোল লোদির মতো ক্ষমতা ভাগাভাগির নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আফগান সর্দারদের জানানো হয় যে, তারা একান্ত ভাবেই সুলতানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সুলতানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরেই তাদের ভালো-মন্দ নির্ভর করত। এইভাবে তিনি আফগান সর্দার ও সাধারণ জনগণ উভয়ের ওপরেই নিজের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা করেন।

ছক ৪.১ : এক নজরে দিল্লির সুলতানি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
মামেলুক (দাস)	১২০৬-১২৯০খ্রিঃ	কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিশ রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবন
খলজি	১২৯০-১৩২০খ্রিঃ	জালালউদ্দিন খলজি আলাউদ্দিন খলজি
তুঘলক	১৩২০-১৪১২খ্রিঃ	মহম্মদ বিন তুঘলক ফিরোজ শাহ তুঘলক
সৈয়দ	১৪১৪-১৪৫১খ্রিঃ	খিজির খান
লোদি	১৪৫১-১৫২৬খ্রিঃ	বহলোল লোদি, সিকান্দর লোদি

মনে রেখো

সৈয়দ ও লোদি শাসকরা ছিলেন আফগান। এর আগের শাসকরা ছিলেন তুর্কি। তাই দিল্লির সুলতানদের শাসনকে একসঙ্গে তুর্কো-আফগান শাসন বলা হয়।

৪.৪ মানচিত্রের সঙ্গে ৪.৫ মানচিত্রের তুলনা করো। এই মানচিত্রে নতুন কোন কোন রাজ্য দেখতে পাচ্ছ তার তালিকা করো।

টুকরো কথা

পানিপতের প্রথম যুদ্ধ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপতে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাবর তুর্কিদের থেকে শেখা এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। একে বলা হয় 'রুমি' কৌশল। মুঘলদের ঘোড়সওয়ার তিরন্দাজ বাহিনী ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও তাদের গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল। বাবরের সৈন্য সংখ্যা কিন্তু লোদিদের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু বাবর ছিলেন যুদ্ধে পটু। যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদির মৃত্যু হয় এবং দিল্লি ও আগ্রায় মুঘলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

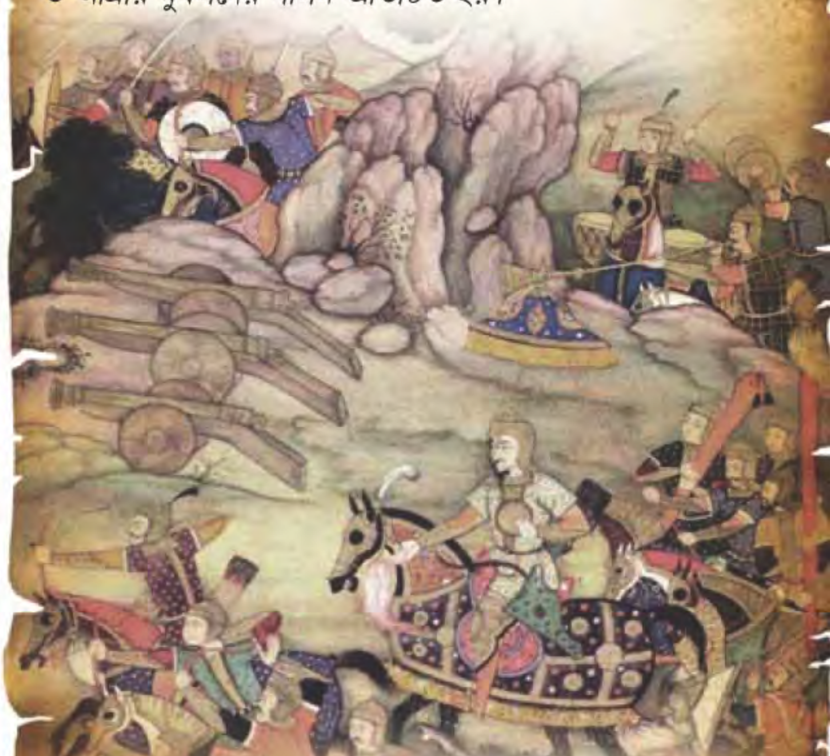

ছবি ৪.২ : পানিপতের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সৈন্যদল। *বাবরনামা*-র ছবি।

৪.৭.১ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সামরিক নিয়ন্ত্রণ

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বারবার অভিযানকারীরা ভারতে এসেছে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে (১২১৮-'২৭ খ্রিঃ) মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খান মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় ঝড়ের গতিতে যে

অভিযান চালান তার সামনে ওই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতেও মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হলো। দিল্লির সুলতান তখন ইলতুৎমিশ। এই আশঙ্কা পরে চতুর্দশ শতকেও জারি ছিল। মোঙ্গল আক্রমণের সামনে দিল্লির সুলতানদের সকলের নীতি একরকম ছিল না। এবারে দেখা যাক কী ভাবে সুলতানরা এই শক্তির মোকাবিলা করেছিলেন।

১২২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তর-পশ্চিমে বারবার মোঙ্গল আক্রমণ ঘটে। ওই আক্রমণের সামনে সিন্ধু নদ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বলে চিহ্নিত হয়। ইলতুৎমিশ সরাসরি মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে দিল্লি সুলতানিকে বাঁচিয়ে দেন।

চেঙ্গিজ মারা যাওয়ার পর মোঙ্গল রাজ্য একাধিক অংশে ভাগ হয়ে পড়েছিল। তাঁরা ওই সময় পশ্চিম এশিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিল্লির সুলতানরা নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে নিয়েছিলেন। তাঁরা একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকাঠামো ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সময় পেয়ে যান। এর ফলে পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ ঠেকাতে তাঁদের সুবিধা হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন বলবন মন্ত্রী থাকার সময়ে (১২৪৬-'৬৬খ্রিঃ) পাঞ্জাবের লাহোর ও মুলতান শহরদুটো পশ্চিম দিক থেকে মোঙ্গল অভিযানের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। দিল্লি সুলতানির পশ্চিম সীমানা পূর্বদিকে আরো সরে আসে। ঝিলাম (বিতস্তা) নদীর বদলে আরো পূর্বদিকে বিপাশা নদী নতুন সীমানা হয়েছিল। বলবন সুলতান হয়ে (১২৬৬-'৮৭খ্রিঃ) তাবরহিন্দ (ভাতিন্দা), সুনাম ও সামানা দুর্গ সুরক্ষিত করেন। বিপাশা নদী বরাবর সৈন্য ঘাঁটি বসান। তিনি নিজে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকেন। একই সঙ্গে তিনি মোঙ্গলদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন কূটনৈতিক চাল হিসাবে। ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের সঙ্গে লড়াইয়ে বলবনের বড়ো ছেলে যুবরাজ মহম্মদ প্রাণ হারান।

আলাউদ্দিন খলজির সময়ে (১২৯৬-১৩১৬খ্রিঃ) দিল্লি দু-বার আক্রান্ত হয় (১২৯৯/১৩০০খ্রিঃ এবং ১৩০২-০৩খ্রিঃ)। সুলতান বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। সৈনিকদের থাকবার জন্য সিরি নামে নতুন শহর তৈরি হয়। সেনাবাহিনীকে রসদ জোগানোর জন্য দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের উপর বেশি হারে কর চাপানো হয়। দুর্গনির্মাণ, সৈন্যসংগ্রহ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ করে সফলভাবে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করেন আলাউদ্দিন।

৪.২ ছবিতে কী কী অস্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে ১৩২৬-২৭/১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর- পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অভিযান হয়। সুলতান মোঙ্গলদের তাড়া করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কালানৌর ও পেশোয়ারে সীমান্তঘাঁটি মজবুত করেন। তিনি মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা করেন, সেজন্য বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুলতান *পুরোনো দিল্লি* শহরকে সেনা-শিবির বানিয়ে তোলেন। শহরের অধিবাসীদের তিনি দাক্ষিণাত্যে দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দেন। সৈনিকদের বেতন দেওয়ার জন্য দোয়াব অঞ্চলে অতিরিক্ত কর চাপান। শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিরাট সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে বাধ্য হন মহম্মদ বিন তুঘলক।

৪.৭.২ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

সুলতানি শাসনের প্রধান ব্যক্তি সুলতান নিজে। যুদ্ধ, আইন, বিচার, দেশ চালানোর সব ক্ষমতা সুলতানের হাতে থাকত। তবে একজন ব্যক্তি একা সব দিক সামলাতে পারেন না। তাই সুলতান মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। তবে সবাইকেই সুলতানের কাছে অনুগত থাকতে হতো। সুলতানের আদেশ ছিল শেষ কথা। এইভাবে সুলতানকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে।

কখনও কখনও কে আসলে সুলতান হওয়ার যোগ্য— তা নিয়ে গোলমাল হতো। তাই যিনি যখন সুলতান হতেন, তাঁর চেষ্টা থাকত কেউ যেন তাকে নিয়ে প্রশ্ন না করতে পারে। এর জন্য সুলতানরা নিজেদের সবার থেকে আলাদা করে রাখতেন। আর বিচার করতেন কঠোর হাতে। গরিব বা বড়োলোক, অভিজাত বা সাধারণ মানুষ ভেদাভেদ ছিল না বিচারের সময়ে।

যে সুলতান যত ভালোভাবে সবদিক সামলাতে পারতেন, তাঁর শাসন তত বেশিদিন টিকত। তবে বলবনের সময় থেকে সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। সুলতানের উপরে কেউ কথা বলতে পারত না। তার বিরোধিতা করলে শাস্তি পেতে হতো। ফলে, অভিজাতরা (*আমির*) আর সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন করত না। আলাউদ্দিনের সময়ে অভিজাতদের কড়া হাতে দমন করা হয়। কিন্তু, সুলতানের শাসন আলগা হয়ে পড়লেই, অভিজাতদের হাতে ক্ষমতা বেড়ে যেত।

টুকরো কথা

সুলতানি আদবকায়দা

গিয়াসউদ্দিন বলবন চল্লিশচক্র বা বন্দেগান-ই চিহলগানির সদস্য ছিলেন। পরে নিজে যখন সুলতান হলেন, তখন যাতে কেউ তার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতে না পারে তার জন্য দরবারে কতগুলি নিয়ম চালু করেন তিনি। শোনা যায় বলবন খুব জমকালো পোশাক পরে দরবারে আসতেন। কোনো হাসি- তামাসা বা হালকা কথা বরদাস্ত করতেন না। গম্ভীরভাবে দরবারে শাসন কাজ চালাতেন। সুলতানকে দরবার চালাতে দেখে অতিথিদের ভয় করত। আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন তুঘলক একই নীতি নেন। জাঁকজমক করে সাজানো সভার মধ্যে সবচেয়ে দামি পোশাক পরা গম্ভীর সুলতানকে দেখে যে কেউ আলাদা করে চিনতে পারত।

অভিজাত ছাড়াও উলেমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হতো সুলতানকে। যেমন রাজাকে পরামর্শ দিতেন পুরোহিত, তেমনই সুলতানকে পরামর্শ দিতেন উলেমা। তবে বেশিরভাগ সময়েই উলেমার কথা শুনে চলতেন না সুলতানরা। হিন্দু-মুসলমান সব জনগণই সুলতানের প্রজা। ফলে, বাস্তবে শাসন চালাবার জন্যে যা দরকার সুলতানরা তাই করতেন। এই নিয়ে উলেমার সঙ্গে সুলতানদের গোলমালও হতো। সুলতানরা উলেমাকে শাস্তিও দিতেন মাঝেমধ্যে।

তবে নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখতে ওমরাহ ও উলেমার সমর্থনের দরকার হতো সুলতানদের। তাই নানা উপহার ও সম্মান দিয়ে তাদের পাশে রাখতেন সুলতানরা।

টুকরো কথা

উলেমা

আরবি ভাষায় ইল্‌ম মানে হলো জ্ঞান। আলিম মানে হলো জ্ঞানী। বিশেষভাবে যারা ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত তাদের বলে আলিম। একের বেশি আলিমকে বলা হয় উলেমা। উলেমা শব্দটিই বহুবচন। তাই উলেমারা বা উলেমাদের কথাগুলো ঠিক নয়।

সামরিক ব্যক্তিদের হাতে ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্ব— ইকতা ব্যবস্থা

সুলতানি শাসন ব্যবস্থা প্রথম দিকে পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী সুলতানরাও সামরিক শক্তিকে শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ বলে মনে করতেন। তবে তারা ধীরে ধীরে একটি সুসংহত, কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলেন। নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সুলতানের নির্দেশে রাজস্ব আদায় করার অধিকার পেতেন।

দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশ বাড়িয়ে ছিলেন। নতুন অধিকার করা অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন ছিল। সেখানে শান্তি বজায় রাখারও দরকার ছিল। সুলতানরা যে সব রাজ্য জয় করলেন, সেই রাজ্যগুলি এক একটি প্রদেশের মতো ধরে নেওয়া হলো। এই প্রদেশ গুলিকেই বলা হতো *ইকতা*। ইকতার দায়িত্বে থাকতেন একজন সামরিক নেতা। তাঁকে বলা হতো *ইকতাদার* বা *মুক্‌তি* বা *ওয়ালি*। ইকতাগুলিকে ছোটো ও বড়ো এই দু-ভাগে ভাগ করা হতো। ছোটো ইকতার শাসক শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। আর বড়ো ইকতার শাসকদের সামরিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা করা, বাড়তি রাজস্ব সুলতানকে দেওয়া, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব বড়ো ইকতার শাসকদের নিতে হতো। ইকতাদাররা সম্পুর্ণভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

টুকরো কথা

ইকতা ব্যবস্থার কথা

মধ্য এশিয়ার ইসলামীয় সাম্রাজ্যে সামরিক অভিজাতদের ইকতা দেওয়া হতো। এই ইকতাগুলি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় নবম শতকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। রাজকোষে তখন যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব জমা পড়ছিল না। এদিকে যুদ্ধ করেও তেমন ধনসম্পদ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই সামরিক নেতাদের বেতনের বদলে ইকতা দেওয়া হতে থাকে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে সেলজুক তুর্কি সাম্রাজ্যে ইকতা ব্যবস্থার প্রচলন লক্ষ করা যায়। এ সময়ে সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অংশ ইকতা হিসাবে ভাগ করা হয়। কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। অর্থাৎ বাবা মারা গেলে তার ছেলে একই দায়িত্ব পায়। অটোমান তুর্কিদের আমলে ইকতা ব্যবস্থার পরিবর্তে একই ধরনের অন্য একটি ব্যবস্থার কথা জানা যায়। তাকে বলা হয় ***তিমার****। আবার ইরানে ইল-খানদের শাসনের সময়ে (১২৫৬-১৩৫৩খ্রিঃ) ইকতা প্রথার কথা জানা যায়। মিশরেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মুক্‌তিদের কথা জানা যায়। দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্য বিস্তার, রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রাখার জন্য ইকতা ব্যবস্থার নানা রদবদল ঘটিয়েছিলেন। ইকতাদার বা মুক্‌তি হতে পারতেন একটা গোটা প্রদেশের শাসনকর্তা। অথবা, তিনি হতেন শুধুই একজন রাজস্ব সংগ্রহকারী, যিনি নিজের ভরণপোষণের জন্য একখন্ড জমি থেকে রাজস্ব আদায় করতেন।*

সুলতানির বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকেরা অনেক সময় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করতেন। জালালউদ্দিন খলজি অথবা বহলোল লোদির মতো অনেকেই প্রথমে আঞ্চলিক শাসক ছিলেন। পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করে সুলতান হন।

৪.৭.৩ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও জনকল্যাণকর সংস্কার

রাজকোষের আয় বাড়াতে আলাউদ্দিন খলজি কতগুলি অর্থনৈতিক সংস্কার করেন। আগের সুলতানদের দেওয়া ইকতা বাজেয়াপ্ত করেন। ধর্মীয় কারণে দেওয়া সম্পত্তি ও নিষ্কর জমিগুলি ফিরিয়ে নেন। সমস্ত জমি জরিপ করানো হয়। রাজস্বের হারও বাড়ানো হয়। তার পাশাপাশি সুলতান সুলতানির খরচ কমাতেও চেষ্টা করেছিলেন। আলাউদ্দিন দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা-যমুনা

নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) অধিবাসীদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করেন। এখানে জমি উর্বর হওয়ায় চাষ হতো খুব ভালো। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও গৃহকর, গোচারণভূমি কর, জিজিয়া কর ইত্যাদি কর রাজাদের কাছ থেকে আদায় করার নির্দেশ দেন।

টুকরো কথা

জিজিয়া কর ও তুরুষ্কদণ্ড

অ-মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে মুসলমান শাসকরা জিজিয়া কর আদায় করতেন। এটি ছিল একটি মাথাপিছু কর। এর বিনিময়ে অ-মুসলমানদের জীবন, ধর্ম পালনের অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষা দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরবের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু প্রদেশে প্রথম জিজিয়া কর চালু করেছিলেন।

দিল্লি সুলতানিতে ব্রাহ্মণ, নারী, নাবালক ও দাসদের জিজিয়া দিতে হতো না। সন্ন্যাসী, অন্ধ, খঞ্জ ও উন্মাদ ব্যক্তিরা যদি গরিব হতেন তবে তাদেরকেও জিজিয়া দিতে হতো না। আলাউদ্দিন খলজি খরাজের সঙ্গেই জিজিয়া নিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবশালী অ-মুসলমান ব্যক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কমানো। কারণ, সুলতান ভাবতেন তারাই সাম্রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্ম দিত। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-'২৪খ্রিঃ) এমন ভাবে জিজিয়া চাপান যাতে অ-মুসলমান প্রজারা একেবারে দরিদ্র না হয়ে পড়ে, আবার তারা মাথা চাড়া দিয়েও উঠতে না পারে। ফিরোজ শাহ তুঘলক খানিকটা ব্যতিক্রমী ভাবে ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

জিজিয়া করের মতো এক ধরনের কর কোনো কোনো হিন্দু রাজারাও চালু করেছিলেন। এই কর তারা চাপাতেন তাদের মুসলমান প্রজাদের উপর। ওই করকে বলা হতো তুরুষ্কদণ্ড (তুর্কিদের/মুসলমানদের উপর চাপানো কর)।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। এর মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন, এবং ঐ সৈন্যদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। আলাউদ্দিন বাজারের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেন। আলাউদ্দিন খলজির আমলে দিল্লিতে চারটি বড়ো বাজার ছিল। এইসব বাজারে খাদ্যদ্রব্য, ঘোড়া, কাপড়

টুকরো কথা

খরাজ, খামস, জিজিয়া ও জাকাত

ফিরোজ তুঘলকের আমলে চার ধরনের কর আদায় করা হয়। এগুলি হলো— খরাজ– কৃষিজমির উপর আরোপ করা কর। খামস— যুদ্ধের সময়ে লুট করা ধন সম্পদের একটি অংশ। জিজিয়া– অ-মুসলমানদের উপর আরোপ করা কর। জাকাত– মুসলমানদের সম্পত্তির উপর আরোপ করা কর।

ইত্যাদি বিক্রি হতো। বাজারদর তদারকির জন্য 'শাহানা-ই মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই রিয়াসৎ' নামে রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সুলতানের ঠিক করে দেওয়া দামের থেকে বেশি দাম নিলে বা ক্রেতাকে ওজনে ঠকালে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দিন রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রয়োজনের সময়ে প্রজাদের সুলতানের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য ও রোজের প্রয়োজনীয় জিনিস পরিমাণ মতো যোগান দেওয়া হতো।

ছবি ৪.৩ : সুলতান আলাউদ্দিন খলজির একটি সোনার মুদ্রার দুটি পিঠ।

মহম্মদ বিন তুঘলকের আর্থিক পরীক্ষার কথা তোমরা আগেই জেনেছো। তাঁর পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের রীতিনীতি এবং উলেমার নির্দেশে শাসন পরিচালনা করতেন। তবে বেশ কিছু জনকল্যাণকর কাজও তিনি করেছিলেন। ফিরোজ রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ইসলামীয় রীতি অনুযায়ী যে সমস্ত কর আদায় করা যেতে পারে, শুধু সেই করগুলি নেওয়া হতো। অন্যান্য কর বাতিল করা হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একাধিক নতুন নগর, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল এবং বাগান তৈরি করেন। দরিদ্রদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি দপ্তর খোলেন। সেখান থেকে চাকরি দেওয়া হতো। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। বেশ কিছু খাল খনন করা হয়। তাছাড়া যে সব জমিতে চাষ হতো না, সেই জমির সংস্কার করেন সুলতান।

৪.৮ প্রাদেশিক শাসন

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ দিক থেকেই দিল্লির সুলতানি শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলায় ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন, এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের শাসন।

৪.৮.১ বাংলায় ইলিয়াসশাহি ও হোসেনশাহি শাসন

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন। তিনি বাংলার তিনটি প্রধান রাজ্য লখনৌতি, সাতগাঁ এবং সোনারগাঁ যুক্ত করে বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু করলেন। ইলিয়াস শাহ পূর্ব বঙ্গ এবং কামরূপকে তাঁর শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। দিল্লিতে তখন ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসন করছেন। তিনি ইলিয়াসের রাজধানী পাণ্ডুয়া দখল করে নেন।

টুকরো কথা

দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ

ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন, ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এই দুর্গটির কোনো চিহ্নই আজ আর নেই। দুর্গটি ঘিরে ছিল গঙ্গার দুই শাখা নদী— চিরামতি এবং বালিয়া। গৌড় থেকেও এই দুর্গটি খুব দূরে ছিল না। দুর্গটি প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল।

ফিরোজ শাহ সৈন্য সমেত ফিরে যাওয়ার ভান করেন। সে সময়ে ইলিয়াস শাহের সৈন্য একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ফিরোজ শাহকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে যায়। ফিরোজ শাহ তৈরি ছিলেন। যুদ্ধে দিল্লির সুলতান জয়ী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ দখল করতে পারেননি। বাংলায় শাসক হিসেবে তাই ইলিয়াস শাহই থেকে গেলেন।

ছবি ৪.৪ : শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর একটি মুদ্রার দুটি পিঠ।

মনে রেখো

- সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-'৫৮খ্রিঃ) বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি দিল্লির সুলতানি শাসনের আওতার বাইরে এই স্বাধীন শাসন তৈরি করেছিলেন।
- সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন ফারসি কাব্যের একজন সমঝদার। তাঁর আমলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য জোরদার হয়েছিল।
- সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু) (১৪১৫-'১৬, ১৪১৮-'৩৩খ্রিঃ) জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বাংলার রাজধানী মালদহের হজরত পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে চলে আসে।
- অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তী ইলিয়াসশাহি সুলতানরা ছিলেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর বংশধর।
- ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসনের মাঝে বাংলায় আবিসিনীয় সুলতানরা শাসন করেছিলেন। এরা আফ্রিকার আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া থেকে এসেছিলেন। বাংলায় এদের হাবশি বলা হয়।
- আফগান নেতা শের খানের আক্রমণে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন শেষ হয়।

ছক ৪.২ : এক নজরে ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
ইলিয়াসশাহি	১৩৪২-১৪১৪/১৫খ্রিঃ	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
রাজা গণেশের বংশ	আনু. ১৪১৪/১৫-১৪৩৫খ্রিঃ	রাজা গণেশ, জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু)
পরবর্তী ইলিয়াসশাহি	আনু. ১৪৩৫-১৪৮৬খ্রিঃ	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ, রুকনউদ্দিন বরবক শাহ
হোসেনশাহি	১৪৯৩-১৫৩৮খ্রিঃ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর ছাব্বিশ বছরের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রিঃ) শাসনকাল বিখ্যাত তাঁর উদারনীতির জন্য। তাঁর রাজত্বে হিন্দুদের দেওয়া হতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ। আলাউদ্দিনের উজীর, প্রধান চিকিৎসক, তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ও টাঁকশালের অধ্যক্ষ সবাই ছিলেন হিন্দু। সুলতান হোসেন শাহ স্বভাবে ছিলেন ভদ্র, বিনয়ী এবং সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। শোনা যায় যে, হোসেন শাহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। নাম করা দুই বৈষ্ণব ভাই রূপ ও সনাতনের মধ্যে একজন হোসেনের দপ্তরে ব্যক্তিগত সচিব (দবির-ই খাস) পদ পান। সাধারণ মানুষ নাকি হোসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার বলে মনে করত। বাংলা ভাষা চর্চায় ভীষণ উৎসাহী ছিলেন হোসেন শাহ তাঁর শাসনকালে বাংলা ভাষায় লেখালেখির চর্চা উন্নত হয়।

ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির উন্নয়ন হয়েছিল। এই সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়। এই সময়ের সুলতানরা ছিলেন অন্য ধর্মমত বিষয়েও উদার। সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা বাংলায় সব ধর্মের মানুষকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিলেন। এই সময়েই বাংলায় শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তিবাদের প্রচার শুরু হয়।

টুকরো কথা

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবত-এ লিখেছেন যে, সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কে একটি নির্দেশ দেন। তাতে বলা হয়, চৈতন্যদেব সবাইকে নিয়ে কীর্তন করুন অথবা চাইলে তিনি একাকী থাকুন। তাঁকে যদি কেউ বিরক্ত করে, তা সে কাজি হোক বা কোতোয়াল, তার প্রাণদণ্ড হবে।

৪.৮.২ দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান

গল্প আছে যে সঙ্গাম নামের এক ব্যক্তির ছেলেরা ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে দুজন হলেন প্রথম হরিহর ও বুক্ক। বিজয়নগরে ১৩৩৬ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট চারটি রাজবংশ শাসন করেছিল। এই বংশগুলি হলো সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরাবিড়ু।

প্রথম হরিহর ও বুক্ক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গম রাজবংশ প্রায় দেড়শো বছর টিকেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায়। সঙ্গম বংশের দুর্বল শাসক বিরূপাক্ষকে সরিয়ে নরসিংহ সালুভ বিজয়নগরে সালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অযোগ্য শাসকের জন্য সালুভ রাজবংশের পতন ঘটে। সালুভ রাজবংশের সেনাপতির ছেলে বীরসিংহ সালুভ বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তুলুভ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের বিখ্যাত শাসক। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরের গৌরব সবচেয়ে বেড়েছিল। সে সময়ে সাম্রাজ্যের সীমা বেড়েছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। এছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি তাঁর সময়ে লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তেলুগু ভাষায় লেখা *আমুক্তমাল্যদ* গ্রন্থে তিনি রাজার কর্তব্যের কথা লিখেছেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হাসান গঙ্গু ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ নাম নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন আহ্‌সনাবাদ। শাসনের সুবিধার জন্য বাহমন শাহ তাঁর রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করেন। এই ভাগগুলি হলো গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার এবং বিদর। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের মৃত্যুর (১৩৫৮খ্রিঃ) পর তাঁর ছেলে মহম্মদ শাহ গুলবর্গার শাসক হন। বাহমনি বংশের সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রিঃ) একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। শিল্পের প্রতিও তাঁর উৎসাহ ছিল।

ছবি ৪.৩ : গুলবর্গা দুর্গের একটি অংশ, উত্তর কর্ণাটক।

টুকরো কথা

রাজা কৃষ্ণদেব রায়

পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে বিজয়নগর রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। পেজ বলেছেন—
" রাজাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত এবং সর্বোত্তম একজন মহান শাসক এবং সুবিচারক, সাহসী ও সর্বগুণান্বিত''।

এরপর বাহমনি রাজ্যের রাজধানী চলে আসে বিদর শহরে। বাহমনি রাজ্যের শাসক তৃতীয় মহম্মদের শাসনকালে (১৪৬৩-'৮২খ্রিঃ) তাঁর মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান বাহমনি রাজ্যের গৌরব বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং পরিচালক। তাঁর নির্দেশে তৈরি বিদর শহরের মাদ্রাসাটি খুবই বিখ্যাত।

মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (১৪৮১ খ্রিঃ) পর বাহমনি রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়ে। পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উদ্ভব হয়। সেগুলি হলো আহমেদনগর, বিজাপুর, বেরার, গোলকোন্ডা এবং বিদর।

ছবি ৪.৬ : মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা, বিদর (পঞ্চদশ শতক)

কৃয়দেব রায়ের মৃত্যুর পর তুলুভ রাজত্বকালেই বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনি রাজ্যের উত্তরসূরী পাঁচটি সুলতানির মিলিত শক্তির যুদ্ধ হয়। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বানিহাটি বা তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয়।

বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্য দুটি প্রথম থেকেই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটানা লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধানত রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই লড়াই হয়েছিল।

এই যুদ্ধের পরে তুলুভ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আরাবিড়ু বংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। এই বংশের প্রথম শাসক ছিলেন তিরুমল এবং শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্কট।

ভেবে বলো

বিজয়নগর এবং দক্ষিণের সুলতানিগুলির মধ্যে তিনটি অঞ্চলকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এই অঞ্চল গুলি হলো— তুঙ্গভদ্রা নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল, কৃয়া-গোদাবরী নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং মারাঠওয়াড়া দেশ। এইসব জায়গার জমি উর্বর এবং বাণিজ্যের প্রভাব বেশি ছিল। মনে রেখো এই জায়গাগুলিকে ঘিরে দ্বন্দ্ব শুধু বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের মধ্যে হয়নি। তার আগেও চালুক্য ও চোল রাজাদের মধ্যে এবং যাদব ও হোয়সল রাজাদের মধ্যে এই অঞ্চলকে নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল।

কৃষ্ণা নদীর উত্তর ও দক্ষিণ—দুই পারের শাসকরাই উপাধি নিতেন 'সুলতান'। দিল্লির সুলতানদের অনেক আদবকায়দা তারা মেনে চলতেন। বিজয়নগরের শাসকরা নিজেদের বলতেন হিন্দু রাইদের (রাজা) মধ্যে সুলতান। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় নিজের বাহিনীর জন্য তুর্কি যুদ্ধপদ্ধতি আমদানি করেন। তার আমলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

তাহলে ভেবে দেখোতো, বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির সংঘর্ষকে কি হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘর্ষ বলা চলে?

মানচিত্র ৪.৬ : বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

মনে রেখো

- কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে বলা হয় রাইচুর দোয়াব।
- বাহমনি রাজ্যে দেশীয় অভিজাতদের বলা হতো দক্ষিণী। এই অঞ্চলের বাইরে থেকে যে অভিজাতরা এসে দরবারে স্থান পেতেন তাঁদের বলা হতো পরদেশী। অর্থাৎ 'দেশ' বলতে মানুষ কেবল নিজের এলাকাটাই বুঝতো।

কোনো দেশ বিষয়ে বিদেশি পর্যটকের বিবরণ কি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়? এর পক্ষে-বিপক্ষে তোমার কী কী যুক্তি?

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে বিজয়নগর

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বিদেশি পর্যটক আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারস্যের দূত আব্দুর রাজ্জাক, পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ ও নুনিজ, দুয়ার্তে বারবোসা প্রমুখ। এঁরা সকলেই বিজয়নগরের সম্পদ দেখে বিস্মিত হন। বিজয়নগর শহরটি সাতটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কৃষিই ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। ভূমি রাজস্বই ছিল রাজ্যের প্রধান আয়। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পোর্তুগিজদের সঙ্গে ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তবে পর্যটকরা একথাও বলেছেন যে ধনী ও গরিবদের জীবনযাপনে অনেক তফাৎ ছিল।

টুকরো কথা

পর্যটক পেজের বর্ণনায় বিজয়নগর

“......নগরটি রোম শহরের মতোই বড়ো, দেখতে বড়োই সুন্দর। নগরের ও বাড়িগুলির বাগানের মধ্যে অনেক গাছের কুঞ্জ আছে। স্বচ্ছ জলের অনেকগুলি খাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাঝে মাঝে আছে দীঘি, রাজপ্রাসাদের কাছেই আছে তালবন ও অন্যান্য ফলের গাছ। এই নগরের লোকসংখ্যা অসংখ্য। রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে এত লোক ও হাতি চলাচল করে যে তার মধ্যে দিয়ে অশ্বারোহী বা পদাতিক কোনো সৈন্য যেতে পারে না।

এ শহরটির মতো এত খাওয়া- পরার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে নেই। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাস্তায় ও বাজারে ভারবাহী এত ষাঁড় চলাচল করে যে তাদের মধ্য দিয়ে যাওয়া যায় না, হয়তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিংবা অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হয়।”

ছবি ৪.৭ : বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানী হাম্পির একটি রথমন্দিরের আঁকা ছবি।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। **নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও :** **পূর্ণমান ১**

(ক) ইলতুৎমিশ, রাজিয়া, ইবন বতুতা, বলবন।

(খ) তাবরহিন্দ, সুনাম, সামানা, ঝিলাম।

(গ) খরাজ, খামস, জিজিয়া, আমির, জাকাত।

(ঘ) আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, পাঞ্জাব, বিদর।

(ঙ) বারবোসা, মাহমুদ গাওয়ান, পেজ, নুনিজ।

২। **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :** **পূর্ণমান ১**

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
খলিফা	বাংলা
বলবন	দুরবাশ
খলজি বিপ্লব	বাবর
রুমি কৌশল	তুর্কান-ই চিহলগানি
রাজা গণেশ	ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতার অবসান

৩। **সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :** **পূর্ণমান ৩**

(ক) দিল্লির সুলতানদের কখন খলিফাদের অনুমোদন দরকার হতো?

(খ) সুলতান ইলতুৎমিশের সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা কী ছিল?

(গ) কারা ছিল সুলতান রাজিয়ার সমর্থক? কারা ছিল তাঁর বিরোধী?

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজি কীভাবে মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করেন?

(ঙ) ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :** **পূর্ণমান ৫**

(ক) ৪.২ মানচিত্র থেকে আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিবরণ দাও।

(খ) দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের অভিজাতদের কেমন সম্বন্ধ ছিল তা লেখো।

(গ) ইকতা কী? কেন সুলতানরা ইকতা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন?

(ঘ) আলাউদ্দিন খলজির সময় দিল্লির বাজার দর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

(ঙ) বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে তুমি কী একটি ধর্মীয় লড়াই বলবে? তোমার যুক্তি দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে দিল্লির একটি বাজারে যেতে তাহলে কেমন অভিজ্ঞতা হতো তা লেখো।

(খ) মনে করো তুমি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারে একজন রাজকর্মচারী। সে যুগের ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে যদি তুমি একটি বই লিখতে তা হলে তাতে কী লিখতে?

(গ) মনে করো তুমি রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে পোর্তুগাল থেকে বিজয়নগর রাজ্যে বেড়াতে এসেছো। এ দেশের অবস্থা দেখে তুমি নিজের দেশের এক বন্ধুকে চিঠিতে কী লিখবে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য

৫.১ মুঘল কারা?

খ্রিস্টীয়ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মুঘলরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। অবশ্য খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকেই তাদের ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির বাস। সেখানে এতবছর ধরে শাসন পরিচালনা করা খুবই কঠিন কাজ। মুঘলরা দক্ষতার সঙ্গেই সেই কাজ চালিয়েছিল।

একদিকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান এবং অন্য দিকে তুর্কি নেতা তৈমুর লঙ-এর বংশধরদের আমরা মুঘল বলে জানি। মুঘলরা তৈমুরের বংশধর হিসেবে গর্ববোধ করত। নিজেদের তারা তৈমুরীয় বলে ভাবত। বরং, চেঙ্গিস খানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কম ছিল। ভারতবর্ষের প্রথম মুঘল বাদশাহ ছিলেন জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর (১৫২৬-'৩০খ্রিঃ)।

সফাবি—সফাবিরা ছিল ইরানের একটি রাজবংশ। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তারা শাসন করে।

উজবেক—উজবেকরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি তুর্কিভাষী জাতি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে তারা মধ্য এশিয়ায় একাধিক রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

টুকরো কথা

তৈমুর লঙ ও বাবর

১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। তাই মুঘলরা মনে করত উত্তর ভারতে তাদের শাসনের অধিকার আছে। ভারতবর্ষে আসার আগে মুঘলরা মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চলে শাসন করত। এর আগে চতুর্দশ শতকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে তৈমুর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেন। এই অঞ্চলগুলি হলো পূর্ব ইরান বা খোরাসান, ইরান, ইরাক, এবং তুরস্কের কিছু জায়গা। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে তৈমুরীয় শাসকদের ক্ষমতায় ভাঁটা পড়ে। এর প্রধান কারণ ছিল তাঁদের বংশধরদের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত করার রীতি। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তৈমুরীয় বংশের বাবর মাত্র বারো বছর বয়সে ফরগনা প্রদেশের শাসনভার পান। পরবর্তীকালে মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে উজবেক এবং সফাবিদের মতো সাফল্য না পেয়ে বাবর অবশেষে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন।

ছবি ৫.১ : খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে আঁকা এই ছবির মধ্যের ব্যক্তিটি তৈমুর লঙ। সঙ্গে তাঁর বংশধররা। এর মধ্যে রয়েছেন প্রথম ছয়জন মুঘল সম্রাট।

বাদশাহ কে?

মুঘলরা সার্বভৌম শাসকের ক্ষেত্রে *পাদশাহ* অথবা *বাদশাহ* শব্দটি ব্যবহার করত। তোমরা দেখেছো আগে দিল্লির শাসকেরা নিজেদের *সুলতান* বলতেন। মুঘলরা কিন্তু সুলতান শব্দটি যুবরাজদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করত। যেমন ধরো, জাহাঙ্গিরের নাম ছিল সলিম। তিনি যখন যুবরাজ হলেন, তখন তাঁকে বলা হতো সুলতান সলিম। বাদশাহ উপাধি ব্যবহার করে মুঘলরা বোঝাতে চাইলো যে, তাদের শাসন করার ক্ষমতা অন্য কারোর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল নয়।

কথার মানে

বাদশাহ— বাদশাহ বা পাদশাহ বা পাদিশাহ শব্দগুলি ফারসি। *পাদ* অর্থাৎ প্রভু এবং *শাহ* অর্থাৎ শাসক বা রাজা, এই দুটি শব্দ এখানে যোগ হয়েছে। মনে হতে পারে প্রায় একই অর্থবিশিষ্ট দুটি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করার কারণ কী? খুব শক্তিশালী শাসক বোঝাতে একসঙ্গে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে বাবর কাবুলে থাকার সময় পাদশাহ উপাধি নেন।

সার্বভৌম শাসক— সার্বভৌম শাসক বলতে বোঝায় সর্ব ভূমির উপর যার আধিপত্য। সর্ব ভূমি বা গোটা পৃথিবীর উপর তো কোনো একজন মানুষের আধিপত্য থাকতে পারে না। অর্থাৎ বুঝতে হবে যাঁর আধিপত্য একটি বিরাট অঞ্চলের উপর থাকে এবং যিনি সেখানে নিজের ক্ষমতায় শাসন করেন, তিনি সার্বভৌম শাসক। এই কথাটি শুধু সেই শাসক নিজে জানলেই হবে না, সবাই সেটা মেনে নিলেই তাঁর অধিকার টিকে থাকবে।

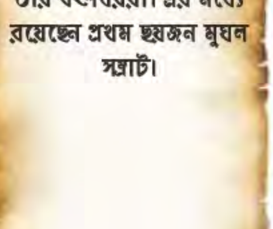

৫.১ ছবিতে যে এগারো জনের ছবি রয়েছে, তারা একসঙ্গে একই সময়ে জীবিত ছিলেন না। তাহলে এমন ছবি আঁকার কারণ কী হতে পারে?

৫.২ মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তার : যুদ্ধ ও মৈত্রী

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শুধু যুদ্ধের উপরই নির্ভর করে ছিল না। একদিকে ভারতবর্ষের ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত হয়েছিল। আবার তাদের সঙ্গে মৈত্রীও হয়েছিল। আমরা আগেই জেনেছি যে, পানিপতের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬খ্রিঃ) বাবর আফগান শক্তিকে পরাজিত করেন। আফগানরা ছাড়াও এই সময় ভারতের আর এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছিল রাজপুতরা। রাজপুত শক্তিও বাবরের কাছে পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে রাজপুতরা মুঘলদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছিল।

টুকরো কথা

মুঘল রণকৌশল

পানিপত ও খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের রণকৌশল একদিকে কামান ও বন্দুকধারী সৈন্য এবং অন্যদিকে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার তিরন্দাজ বাহিনী এই দুইয়ের যৌথ আক্রমণের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটা অংশ শত্রুপক্ষকে দুই পাশ আর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করত এবং কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যরা সামনে থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করত। একসাথে এই দুই রকম আক্রমণে শত্রুপক্ষ যখন দিশাহারা, তখন বাকি ঘোড়সওয়াররা সামনে থেকে আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। এই রণকৌশল ব্যবহার করে তুরস্কের অটোমান তুর্কি সেনাবাহিনী ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে চলদিরানের যুদ্ধে পারস্যদেশের রাজশক্তি সফাবিদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। আবার অটোমানদের কাছে শিখে একই কৌশল অবলম্বন করে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে জামের যুদ্ধে সফাবিরা উজবেকদের হারিয়ে দেয়।

একনজরে বাবরের আমলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রিঃ)— মেওয়াড়ের রানা সংগ্রাম সিংহ (রানা সঙ্গ) রাজপুতদের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাবর মুঘল যোদ্ধাদের বলেন এই যুদ্ধ তাদের ধর্মের লড়াই। তারা হলেন ধর্মযোদ্ধা বা গাজি। আসলে এভাবে তিনি সকলকে জোটবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। আবার, উত্তর ভারত থেকে বাবরকে হটানোর জন্য কয়েকজন মুসলমান শাসকও রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন। কাজেই এই যুদ্ধ ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না।

ঘর্ঘরার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রিঃ)— আফগানদের বিরুদ্ধে বাবর এই যুদ্ধ করেন। আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার শাসক নসরৎ শাহ। এই যুদ্ধে জিতলেও বাবর বিহারে পাকাপাকি অধিকার কায়েম করতে পারেননি।

মুঘল উত্তরাধিকার নীতি

বাবরের সঙ্গে তাঁর সামরিক অভিজাতদের পারিবারিক এবং বংশগত যোগ ছিল। শাসকশ্রেণির সঙ্গে অভিজাতদের এই যোগ মুঘল শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আমলে (১৫৩০-'৪০, ১৫৫৫-'৫৬খ্রিঃ) কিন্তু এই যোগ অনেকটাই আলগা হয়ে পড়ে। তাঁর দুঃসময়ে ভাইয়েরা তাঁকে সাহায্য করেনি।

তৈমুরীয় নীতি মোতাবেক উত্তরসূরিদের মধ্যে যে অঞ্চল ভাগ করার প্রথা ছিল, হুমায়ুন কিন্তু তা মানেননি। বাবরও শাসক হিসাবে হুমায়ুনকেই মনোনীত করে গিয়েছিলেন। হুমায়ুন সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতেই রেখেছিলেন। ভাইদের কেবল কিছু অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সরাসরি শাসনের দায়িত্ব না পাওয়ায় তাঁরাও সাম্রাজ্য রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেননি। তাই শেষমেশ একজোট হয়েও আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী জয়ী হতে পারেনি।

কথার মানে

সামরিক অভিজাত

সামরিক অভিজাত তাদের বলা যায় যাঁরা বংশগত ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এছাড়া তারা খুব গুরুত্বপুর্ণ পদও পেতেন। অনেক সময় এঁদের রাজপরিবারের সঙ্গে পারিবারিক যোগ থাকতো।

টুকরো কথা

বাবরের প্রার্থনা : সত্যি হলেও গল্প

হুমায়ুন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন সদ্য আফগানিস্তানের বদখশান থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছেন। বাবরের কাছে হুমায়ুনের অসুস্থতার খবর পৌঁছল। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। হুমায়ুন যখন দিল্লি পৌঁছলেন, তখন তিনি এতটাই অসুস্থ যে ঘোরের মধ্যে ছিলেন। শোনা যায় এই সময় বাবরকে একজন পরামর্শ দেন যে, হুমায়ুনের খুব প্রিয় কোনো জিনিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করলে হয়ত তাঁকে বাঁচানো যাবে। তখন বাবর নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এর পরের গল্পটা কিন্তু ইতিহাস বলে ধরে নেওয়া যায় না। বলা হয় বাবরের প্রার্থনায় হুমায়ুন প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। এর পরেই বাবর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মারা যান। গল্পকথা হলেও এর থেকে এটুকু বোঝা যায় যে হুমায়ুন ছিলেন বাবরের প্রিয়পুত্র। তাই তিনি হুমায়ুনকেই শাসক হিসাবে মনোনীত করেছিলেন।

টুকরো কথা

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব

মুঘলদের বিরোধীরা সবসময় একজোট ছিল না। মুঘলদের দুই প্রধান বিরোধী শক্তি রাজপুত এবং আফগানদের মধ্যে বিরোধ ছিল। এদের মধ্যে বিহারে আফগানদের নেতৃত্ব দেন হুমায়ুনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী শের খান। হুমায়ুন পর পর দু-বার শের খানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিহারের চৌসার যুদ্ধে আর ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে। তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে হুমায়ুনকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। এই সময়ে পারস্যের শাহ তাহমস্প হুমায়ুনকে আশ্রয় দেন। হুমায়ুনের এই পালিয়ে বেড়ানোর সময়েই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ)। ইতোমধ্যে দিল্লি-আগ্রায় শের খান 'শাহ' উপাধি নিয়ে সম্রাট হন। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ ক্ষমতায় আসেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, সেই সুযোগে হুমায়ুন দেশে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু খুব বেশিদিন হুমায়ুন শাসন করতে পারেননি। দিল্লির পুরানো কেল্লার পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান।

শের শাহের (১৫৪০-'৪৫ খ্রিঃ) সংস্কার

শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শের শাহ কিছু সংস্কার করেছিলেন।

- শের শাহ কৃষককে 'পাট্টা' দিতেন। এই পাট্টা-য় কৃষকের নাম, জমিতে কৃষকের অধিকার, কত রাজস্ব দিতে হবে প্রভৃতি লেখা থাকত। তার বদলে কৃষক রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে কবুলিয়ত নামে অন্য একটি দলিল রাষ্ট্রকে দিত।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে শের শাহ সড়কপথের উন্নতি করেন। তিনি বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সড়ক সংস্কার করান। রাস্তাটির নাম ছিল 'সড়ক-ই আজম'। এই রাস্তাই পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত হয়। এছাড়াও আগ্রা থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরি হয়। লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত আরও একটি রাস্তা তৈরি হয়।
- পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল।
- শের শাহ ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন।
- সেনা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' ব্যবস্থা চালু রাখেন শের শাহ।

ছবি ৫.২ : শেরশাহের সমাধি সৌধ, সাসারাম, বিহার

ছবি ৫.৩ :
বাদশাহ আকবরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ।

আকবর যখন শাসনভার পেলেন (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ), তখন তাঁর বয়স তেরো। অর্থাৎ তখন তিনি তোমাদেরই বয়সী। ভেবে দেখো এই বয়সে সাম্রাজ্য চালানো কী কঠিন কাজ! আকবরকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান। আঠারো বছর বয়সে আকবর সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেন। কিন্তু সে তো পরের কথা। যখন তিনি প্রথম সিংহাসনে বসলেন, তখন দিল্লিতে শের শাহের এক আত্মীয় আফগান শাসন ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করছিলেন। তাঁর নাম আদিল শাহ। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হিমু দিল্লি শহর দখল করে নেন। তোমরা দেখেছো দিল্লি এবং আগ্রা ছিল সে যুগে শাসনক্ষমতার কেন্দ্র। দিল্লি দখল করা মানেই সাম্রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া। বৈরাম খানের সাহায্যে আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপতের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের হারিয়ে দেন। আকবর একে একে মধ্য ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাছে কয়েকটি ছোটো রাজ্য, চিতোর, গুজরাট, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চল জয় করেন। এরপর, মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের সংঘাত হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিরোধকে কিন্তু বহিরাগতদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘাত বলা চলে না। যারা মুঘলদের বিরোধিতা করেছিল, তারা জোটবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষের জন্য লড়াই করেনি।

টুকরো কথা

মুঘলদের মেওয়াড় অভিযান

রাজপুত রাজাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল চিতোর দুর্গ। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবর চিতোর জয় করেন। তার আগেই চিতোরের রানা উদয় সিংহ চিতোর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এরপর অন্যান্য রাজপুতদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি হলেও, উদয় সিংহের ছেলে রানা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের কাছে অধীনতা স্বীকার করলেন না। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটির যুদ্ধে আকবর রানা প্রতাপকে পরাজিত করেছিলেন। এই যুদ্ধের সময় আকবর আজমিরে পৌঁছে রাজা মান সিংহকে ৫০০০ সৈন্য সমেত রানা প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠান। রাজা মান সিংহও কিন্তু রাজপুত ছিলেন। অর্থাৎ মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত শক্তি মিলিত হয়ে লড়াই করেনি। রানা প্রতাপ চিতোর পর্যন্ত গোটা এলাকার ফসল নষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে মুঘল সৈন্য খাবার না পায়। তিনি তাঁর রাজধানী কুম্ভলগড় থেকে ৩০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান। রানার পক্ষে কয়েকজন আফগান সর্দারও ছিল। রানা যুদ্ধে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার পরেও রানা প্রতাপ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

ছবি ৫.৪ :
বাদশাহ আকবরের চিতোর দুর্গ অভিযান। ছবি দুটি *আকবরনামা* গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

টুকরো কথা

আকবরের নবরত্ন সভা ও রাজা বীরবল

আকবরের দরবারে বহু বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে ন-জনকে একত্রে বলা হতো নবরত্ন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা বীরবল। বীরবলের বুদ্ধির অনেক গল্পই হয়তো তোমরা পড়েছ। তার অনেকটা গল্পকথা হলেও বীরবল কিন্তু সত্যিই খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। বীরবলের জন্ম হয় মধ্য প্রদেশের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর নাম ছিল মহেশ দাস। তাঁর বুদ্ধির জোরেই তিনি আকবরের সভায় স্থান পেয়েছিলেন। আকবর তাঁর নাম দেন বীরবল। এখানে বীর এবং বল শব্দগুলি বুদ্ধির জোর বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। তাঁকে 'রাজা' উপাধিও দেওয়া হয়। আকবরের সময় তিনি ওয়াজির-ই আজম বা প্রধানমন্ত্রী হন।

ছবি ৫.৫ : আবুল ফজল বাদশাহ আকবরকে আকবরনামা উৎসর্গ করছেন।

টুকরো কথা

আবুল ফজল ও আবদুল কাদির বদাউনি

আকবরের আমলের এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন আবুল ফজল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২ খ্রিঃ)। তাঁর লেখা আকবরনামায় তিনি আকবরের প্রশংসাই করেছেন। কিন্তু যে কোনো সময়ের ইতিহাস জানতে হলে শুধু ভালো কথা জানলেই হয় না। সে যুগের সমস্যার কথাও জানতে হয়। এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া যায় সে যুগের আর একজন ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনির (১৫৪০-১৬১৫ খ্রিঃ) মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ বইতে। এঁরা দুজনেই মুঘল দরবারে এসেছিলেন ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু আবুল ফজল হয়ে উঠেছিলেন আকবরের প্রিয় পাত্র। একই ঘটনার দু-ধরনের বিবরণ পাওয়া যায় এঁদের দুজনের লেখায়।

এখন আমরা ভারতের যে মানচিত্র দেখি, তখন সেরকম ছিল না। 'দেশ' বলতে তারা কেবল কিছু অঞ্চল কে বুঝত। এই সংঘাত আসলে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছিল। এরা সকলেই ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করেছিলেন।

আকবর শুধু যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমেই শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন স্থানীয় শাসকদের মুঘল দরবারে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিতে। স্থানীয় মানুষের কাছে কেবল আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে চাননি আকবর। মুঘলরা উত্তর ভারত জয় করে দাক্ষিণাত্যেও পৌঁছে গিয়েছিল। এদিকে আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, সিন্ধু প্রদেশ এবং পূর্ব বেলুচিস্তানও মুঘলদের শাসনের আওতায় চলে আসে। ভারতবর্ষের উপর বিদেশি আক্রমণ এই পথেই বেশি হতো। তাই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করতে এই অঞ্চলে মুঘল প্রভাব তৈরি করা দরকার ছিল। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও উন্নত ছিল না। মুঘল সৈন্যকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল।

তোমরা আর কোথাও রাজা বীরবলের গল্প পড়েছো? পড়ে থাকলে সেই গল্পটা নিজের ভাষায় লেখো।

আকবরের মৃত্যুর সময় (১৬০৫ খ্রিঃ) ভারতবর্ষের এক বিরাট এলাকা মুঘলদের দখলে চলে এসেছিল। তবে তার বাইরে দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মুঘলদের অধিকার বলবৎ হয়নি। বাংলায় মুঘলরা সামরিক সাফল্য পেলেও, তার ভিত্তি ছিল নড়বড়ে। সেখানে আফগানদের পুরোপুরি হারিয়ে মুঘল শাসন ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে আরও বেশ কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল।

মানচিত্র ৫.১ :
খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ায় মুঘল সাম্রাজ্য

ছবি ৫.৬ :
জাহাঙ্গিরের আমলের একটি সোনার মোহরের দুটি পিঠ।

আকবরের ছেলে ও উত্তরসূরি জাহাঙ্গিরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহীরা এক সঙ্গে 'বারো ভুঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গির বাংলার জমিদারদের নিজের দলে টানার চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গিরের সময়েই বাংলা ভালো ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর আমলে মেওয়াড়ের রানাও মুঘলদের আধিপত্য মেনে নেন। তবে মুঘলরা কিন্তু সব রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারেনি। যেমন ধরো, শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক ভালো থাকেনি (এই সম্বন্ধে আমরা আরও জানব অষ্টম অধ্যায়ে)।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে মুঘল রাষ্ট্রকাঠামোয় জাহাঙ্গির মোটামুটি ভাবে আকবরের নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। ফলে নতুন নতুন মনসবদাররা মুঘল

শাসন ব্যবস্থায় সামিল হতে থাকে। এ ছাড়া আগে থেকে রাজপুতরা তো ছিলই। আবার, মুঘল দরবারের অভিজাতদের মধ্যেও রেষারেষি চলত। দরবারি অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্বে সম্রাজ্ঞী নূর জাহান, শাহজাদা খুররম (পরবর্তীকালে বাদশাহ শাহ জাহান), নুর জাহানের পরিবারের সদস্যরা ও অন্যান্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

শাহ জাহানের শাসনের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ) শুরুতেই দাক্ষিণাত্যে খান জাহান লোদী বিদ্রোহ করেন। মুঘলদের কাছে তিনি পরাজিত হন। বুন্দেলখন্দের বিদ্রোহ দমন করা এবং আহমেদনগরে অভিযান পাঠানো হয়। শাহ জাহান উজবেকদের থেকে বলখ জয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। শাহ জাহানের আমলেই মুঘলরা কান্দাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়।

টুকরো কথা

বলখ এবং বদখশান

মধ্য এশিয়ায় বলখ এবং বদখশান ছিল বুখরার উজবেক শাসক নজর মহম্মদের অধীনে। তাঁর পুত্র আবদুল আজিজ বিদ্রোহ করেন এবং পিতাকে পরাজিত করেন। নজর মহম্মদ বাদশাহ শাহ জাহানের সাহায্য চান। পরে পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক ভালো হলেও মুঘলরা বলখ আক্রমণ করে। মনে রেখো, মধ্য এশিয়ায় মুঘলদের প্রাচীন বাসভূমি সমরকন্দ। তারা বারবার এই অঞ্চলে ক্ষমতা কায়েম করার চেষ্টা করেছিল।

ছবি ৫.৭ : মুঘলদের দৌলতাবাদ অভিযান। ছবিটি আবদুল হামিদ লাহোরির *পাদশাহনামা* থেকে নেওয়া।

শাহ জাহানের জীবনের শেষদিকে তাঁর ছেলেদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই বেধে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দারাশিকোহ্ ও অন্য ভাইদের হটিয়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৮-১৭০৭খ্রিঃ) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা অনেক চেষ্টায় মুঘলদের দখলে আসে। ফলে মারাঠা ও দক্ষিণী মুসলিম অভিজাতরা মুঘল শাসনে যোগ দেয়। এর ফলে মনসবদারি ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য বেড়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে মনসব পাওয়া নিয়েও অভিজাতদের মধ্যে রেষারেষি তৈরি হয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মথুরায় জাঠ কৃষকরা এবং হরিয়ানায় সৎনামি কৃষকরা বিদ্রোহ করে। শিখ এবং মারাঠাদের মতো আঞ্চলিক শক্তি মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছিল। রাজপুতদের সঙ্গে সংঘাত এবং দাক্ষিণাত্যে একটানা চলতে থাকা যুদ্ধে সাম্রাজ্যের আয়তন যেমন বেড়েছিল, সমস্যাও বেড়েছিল। মুঘলদের সঙ্গে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর যে যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়। মুঘল সাম্রাজ্যকে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

ছবি ৫.৮ :
ঔরঙ্গজেব ও দারাশিকোহ্-র মধ্যে সামুগড়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব জয়ী হন।

শাসনের শুরুতেই ঔরঙ্গজেব উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। অসমের অহোম শাসককে প্রথমে দমন করা গেলেও, তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মুঘলরা চট্টগ্রাম বন্দর দখল করে বাংলাকে পোর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কখনো যুদ্ধ কখনো মৈত্রীর নীতির মাধ্যমে আফগান অধ্যুষিত অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করেন ঔরঙ্গজেব। কিন্তু এখানে মুঘল সৈন্যের একটি বড়ো অংশ বহুদিন ব্যস্ত ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহার করা যায়নি।

বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের নাম ও শাসনকালের একটি তালিকা তৈরি করো।

৫.৩ মুঘলদের রাজপুত নীতি ও দাক্ষিণাত্য নীতির চরিত্র : আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব

৫.৩.১ মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে সম্পর্ক

মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের ক্ষমতা দখল করতে গেলে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা দরকার। কারণ, রাজপুতরাই ছিল উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চলের জমিদার। পরে এই ধারণা থেকেই বাদশাহ আকবর মৈত্রী ও যুদ্ধনীতির সাহায্যে রাজপুতদের মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এলেন। মুঘল বাদশাহ ও শাহজাদাদের সঙ্গে কোনো কোনো রাজপুত পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হলো। এক্ষেত্রে আকবর কিন্তু নতুন কিছু করেননি। এর আগেও মুসলমান শাসকদের সঙ্গে হিন্দু রাজপরিবারের মেয়েদের বিয়ে হতো। আকবর নিজের স্ত্রীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার বজায় রেখেছিলেন। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে তীর্থকর ও জিজিয়া কর তুলে নেন। যুদ্ধবন্দিদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাও তিনি নিষিদ্ধ করেন। এতে সাম্রাজ্যের অ-মুসলমান প্রজারা খুশি হয়েছিল। তবে মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেননি। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই পড়েছি।

আকবরের নীতির ফলে মুঘলরা বীর রাজপুত যোদ্ধাদের পাশে পেয়েছিল। রাজপুতরাও ওয়াতনের বাইরে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুনামের সঙ্গে কাজ করার ও বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পায়। মুঘল বাদশাহের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে রাজপুতরা ওয়াতনের ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারত। তবে কোনো রাজপুত রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল হলে মুঘলরা সেই রাজ্য সাময়িক ভাবে পুরোপুরি হাতে নিয়ে নিত। তারপর মুঘল বাদশাহের ইচ্ছা অনুযায়ী গদিতে নতুন শাসক বসতেন।

টুকরো কথা

ওয়াতন

ওয়াতন কথাটির মানে হলো নিজের ভিটে বা এলাকা, স্বদেশ। যেমন, রাজা ভারমল, ভগবন্তদাস ও মানসিংহের বংশের ওয়াতন ছিল আধুনিক জয়পুর শহরের কাছে অম্বর বা আমের এলাকা।

ছবি ৫.৯ :
মুঘল দরবারে বাদশাহ আকবর রাজপুত অভিজাতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। ছবিটি *আকবরনামা* থেকে নেওয়া।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গির ও শাহ জাহান আকবরের রাজপুত নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। জাহাঙ্গিরের আমলে মেওয়াড়ে মুঘলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রানা প্রতাপের ছেলে অমর সিংহ উঁচু মনসব পেয়েছিলেন। শাহ জাহানের আমলে রাজপুত সর্দাররা দূর মধ্য এশিয়াতেও লড়াই করতে গিয়েছিল। এই আমলেও রাজপুতদের উঁচু পদ দেওয়া হতো।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রাজপুতরা মুঘল মনসবদারি ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল। অম্বরের মির্জা রাজা জয়সিংহ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত অভিজাতদের মধ্যে একজন। মারওয়াড়ের রাঠোর রাজপুত রানা যশোবন্ত সিংহ প্রথমে বাদশাহের বিরোধী ছিলেন। তবে পরে তিনি মোটা রকমের মনসব পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার নিয়ে মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুরে গন্ডগোল শুরু হয়। মুঘলরা ওই রাজ্যটি পুরোপুরি হাতে নিয়ে নেয়। এর ফলে শুরু হয় রাঠোর যুদ্ধ (১৬৭৯ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধে গোড়ার দিকে মেওয়াড় রাজ্য মারওয়াড়ের পক্ষে ছিল। রাঠোর যুদ্ধ মুঘলদের পক্ষে লাভজনক হয়নি। উপরন্তু, আকবর জিজিয়া কর তুলে নেওয়ার একশো বছর পরে ঔরঙ্গজেব আবার জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন (১৬৭৯ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘলদের রাজপুত নীতিতে অনেক মিল ছিল। আবার, কোনো কোনো দিকে অমিলও ছিল।

টুকরো কথা

মারওয়াড়

রাজস্থানের ভাষায় 'ওয়াড়' শব্দের মানে একটি বিশেষ অঞ্চল। মারওয়াড় শব্দটি এসেছে 'মরুওয়াড়' (মরু অঞ্চল) কথাটি থেকে।

৫.৩.২ মুঘল রাজশক্তি ও দাক্ষিণাত্য

বাহমনি রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি সুলতানি রাজ্যের উত্থানের কথা আমরা আগেই পড়েছি। এ সব হলো মুঘলদের ভারতে আসার আগের ঘটনা। আকবরের শাসনকালের প্রথম দিকে যখন উত্তর ভারতে মুঘলরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে, দাক্ষিণাত্যে তখন সুলতানি রাজ্যগুলি একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করছে। মনে রেখো, বিজয়নগরের পরাজয়ের পরে সুলতানি রাজ্যগুলির সামনে রাজ্যবিস্তার করার অনেক সুযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ওই সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে বড়ো বড়ো জমির মালিক মারাঠা সর্দার ও সৈনিকরা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলিতে পুরোনো অভিজাত ও বাইরে থেকে আসা নতুন অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। এর মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে পোর্তুগিজরাও পা রেখেছিল।

এই অবস্থায় মুঘলরা দাক্ষিণাত্যে প্রভাব বাড়াতে চাইল। দাক্ষিণাত্য ছিল দিল্লি-আগ্রা থেকে বহু দূরে। আকবরের ভেবেছিলেন যে দক্ষিণী রাজ্যগুলি অনেক রাজপুত রাজ্যের মতোই মুঘলদের বন্ধু হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি ছিল বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমেদনগর, বেরার, বিদর ও খান্দেশ। ১৫৯৬ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুঘলরা বেরার, আহমেদনগর ও খান্দেশ জয় করে। খান্দেশের গুরুত্বপূর্ণ অসিরগড় দুর্গটিও মুঘলদের হাতে চলে আসে। আহমেদনগরের

প্রধানমন্ত্রী মালিক অম্বরের চেষ্টায় দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে।

জাহাঙ্গির মারাঠা শক্তির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁদের দলে টানবার চেষ্টা করেন। আকবরের সময়ে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের যা অবস্থা ছিল জাহাঙ্গির তাই বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আহমেদনগর রাজ্যটি মুঘলদের দখলে আসে। ঐ বছরেই শাহ জাহান বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সঙ্গে চুক্তি করে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। পরে মুঘলরাই এই চুক্তি ভেঙে দেয়। এর ফলে দাক্ষিণাত্যের শাসকরা মুঘলদের ওপর আস্থা হারান।

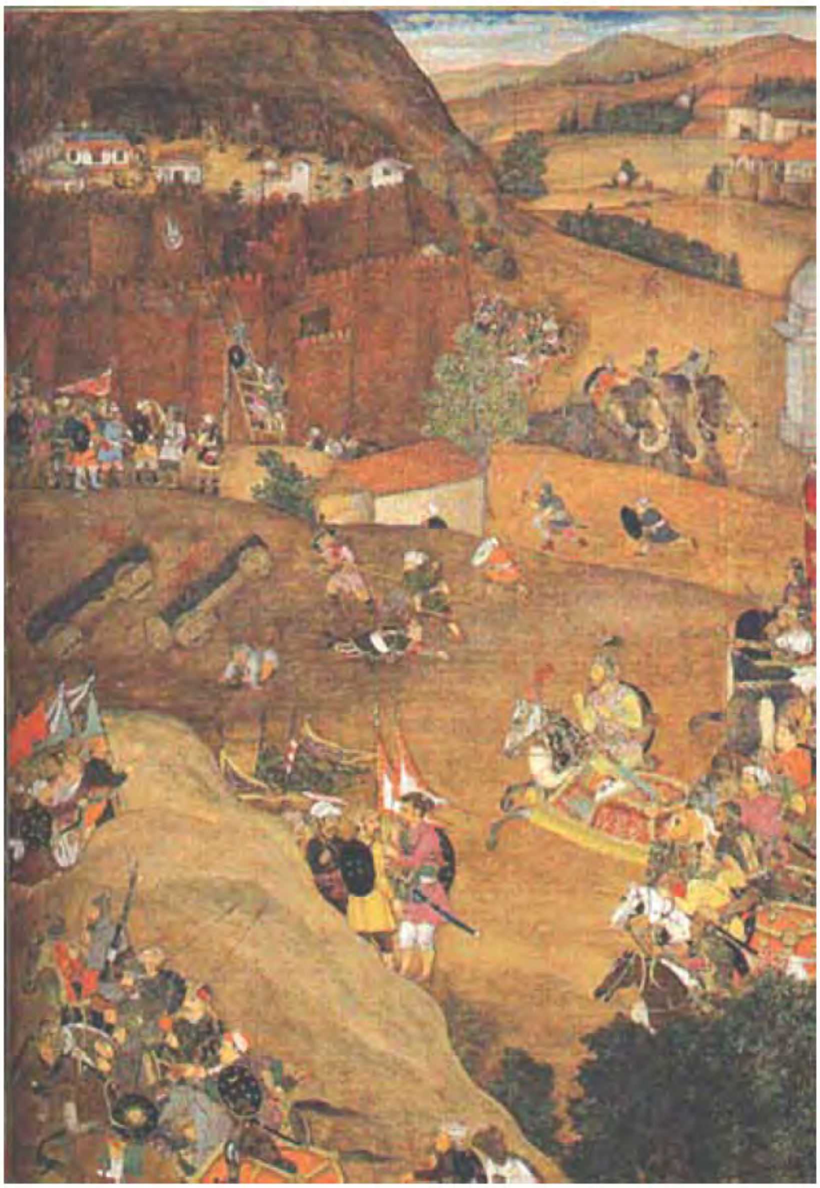

ছবি ৫.১০ :
মুঘল সৈন্য গোলকোন্ডার একটি দুর্গ আক্রমণ করছে (খ্রিস্টীয় ১৭শ শতক)। ছবিটি *পাদশাহনামা* থেকে নেওয়া

৫.৪, ৫.৭, ৫.৮ ও ৫.১০-এই চারটি ছবিতে কোন কোন অস্ত্র ও পশুকে যুদ্ধে ব্যবহার করতে দেখতে পাচ্ছো? এই ছবিগুলি থেকে মুঘলদের যুদ্ধ করার বিষয়ে কী কী জানা যাচ্ছে?

টুকরো কথা

দাক্ষিণাত্য ক্ষত

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ঔরঙ্গজেবের সময়ে মারাঠাদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন যে দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে জয় করতে পারলে সেখানে থেকে অনেক বেশি রাজস্ব আদায় করা যাবে। তার সঙ্গে মারাঠাদের দমন করাও সহজ হবে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘলরা বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা দখল করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন এত বড়ো আগে কখনো হয়নি। কিন্তু বাদশাহ যা ভেবেছিলেন তা হলো না। তার বদলে বহু বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুঘলদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হলো। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের এই ক্ষত আর সারলো না। মারাঠা নেতা শিবাজীকেও স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিতে হলো। পঁচিশ বছর ধরে যুদ্ধ করে ঔরঙ্গজেব শেষে দাক্ষিণাত্যেই মারা গেলেন (১৭০৭ খ্রিঃ)।

মানচিত্র ৫.২ : মুঘল সাম্রাজ্য (আনুমানিক ১৭০০ খ্রিঃ)

৫.৪ বাদশাহি শাসন : প্রশাসনিক আদর্শ

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক আদর্শ ছিল মূলত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে একটি যথার্থই ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। আকবরের প্রশাসনিক আদর্শ তৈমুরীয়, পারসিক এবং ভারতীয় রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ বলা চলে। এই আদর্শে বাদশাহ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করবেন এবং প্রজাদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ ভালোবাসা থাকবে। অর্থাৎ তাঁর শাসন করার অধিকার অন্য কোন শাসকের থেকে পাওয়া নয়। এই ক্ষমতা তাঁর নিজের। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর পক্ষপাত থাকবে না। সকলের প্রতি সহনশীলতা এবং সকলের জন্য শান্তির এই পথকেই বলা হয় '*সুলহ-ই কুল*'। এই আদর্শের ভিত্তিতে আকবর একটি ব্যক্তিগত মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন যাকে বলা হয় '*দীন-ই ইলাহি*'।

প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনকাল যুদ্ধ বিগ্রহেই কেটেছিল। প্রশাসনের দিকে তিনি সেভাবে নজর দিতে পারেননি। মুঘল শাসনের মাঝে আফগান শাসক শের শাহের প্রশাসনিক পরিকাঠামো সুপরিকল্পিত ছিল যা পরবর্তীকালে আকবর অনেকাংশে অনুসরণ করেছিলেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রদেশগুলিকে বলা হতো *সুবা*। সুবাগুলি আবার ভাগ করা হতো কয়েকটি *সরকারে* এবং সরকারগুলি ভাগ করা হতো *পরগনাতে*।

আকবর সামরিক ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন। সেটি ছিল তাঁর মনসবদারি ব্যবস্থা। আকবরের শাসনব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদগুলিকে বলা হতো মনসব। আর পদাধিকারীদের বলা হতো মনসবদার। মনসবদারদের কর্তব্য ছিল বাদশাহের জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখা, সৈন্যদের দেখাশোনা করা এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগান দেওয়া। পদ অনুসারে মনসবদারদের বিভিন্ন স্তর ছিল। সবচেয়ে উপরের পদগুলি কেবল রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য রাখা থাকত। উচ্চপদস্থ মনসবদারদের বলা হতো *আমির*। মনসবদারদের যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে পর্যবেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রাজধানীতে হাজির করতে হতো।

৫.১ ও ৫.২ মানচিত্র দুটির তুলনা করে বলো অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কোন কোন অঞ্চল মুঘল শাসনের আওতায় এসেছিল ?

টুকরো কথা

মনসবদার ও জায়গির

- মনসবদারদের দু-ভাবে বেতন দেওয়া হতো — নগদে অথবা রাজস্ব বরাত দিয়ে। রাজস্বের এই বরাতকে বলা হতো জায়গির। জায়গির যিনি পেতেন তিনি জায়গিরদার। এই ব্যবস্থাকে বলা হতো জায়গিরদারি ব্যবস্থা। যে রাজস্ব আদায় করা হতো, তার এক অংশ দিয়ে জায়গিরদাররা নিজেদের ভরণপোষণ করত এবং ঘোড়সওয়ারদের দেখাশোনা করত। জায়গির মানে কিন্তু জমি নয়। চাষজমি, বন্দর এলাকা, বাজার এ সবের থেকেই রাজস্ব আদায়ের বরাত জায়গির হিসাবে দেওয়া হতো।
- মনসবদারদের বাদশাহ নিজেই নিয়োগ করতেন। তাদের পদোন্নতিও তাঁর উপরই নির্ভর করত।
- জায়গিরদারদের বদলি করা হতো।
- মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল না।

রাজস্ব ব্যবস্থা এবং জাবতি

ভারতবর্ষ ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। তাই ভালভাবে শাসন পরিচালনা করতে হলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য জমি জরিপ করার বা মাপার ব্যবস্থা ছিল। পরে শেরশাহের সময়ও জমি মাপা হয়। আকবর নতুন করে জমি জরিপ করান। জমি জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় 'জাবতি'। 'জাবত' মানে নির্ধারণ। শেরশাহ বিভিন্ন শস্যের মূল্য অনুযায়ী একটি তালিকা তৈরি করিয়েছিলেন। আকবর দেখলেন যে এই তালিকার প্রধান সমস্যা হলো রাজধানীতে শস্যের মূল্যের সঙ্গে অন্যান্য জায়গার শস্যের মূল্য সব সময় মিলছে না। রাজধানীর শস্যমূল্য অন্যান্য জায়গার থেকে বেশি ছিল। রাজধানীর হিসাবে চললে কৃষকদের আরও বেশি রাজস্ব দিতে হতো। তাই আকবর প্রত্যেক বছরের এবং প্রতিটি এলাকার আলাদা হিসাব চালু করলেন। প্রত্যেক এলাকার উৎপাদন, বাজারে শস্যের মূল্য ইত্যাদি নানারকম তথ্য সরকারকে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল কানুনগোদের। রাজস্ব আদায় করত এবং কানুনগোদের তথ্য মিলিয়ে দিত যে সব কর্মচারী তাদের বলা হতো করোরী। আগের দশ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে চালু এই ব্যবস্থাকে

বলা হয় 'দহসালা' ব্যবস্থা। 'দহ' মানে দশ। আকবর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে দহসালা ব্যবস্থা চালু করেন। আকবরকে এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল এবং আরো কয়েকজন রাজকর্মচারী। টোডরমলের নাম থেকেই এই ব্যবস্থার নাম হয় টোডরমলের বন্দোবস্ত। অবশ্য মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র জাবতি ব্যবস্থা চালু ছিল না।

রাজস্ব যাঁরা আদায় করতেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া থাকতো কৃষকদের অত্যাচার না করতে। সরকার দুঃসময়ে কৃষকদের ঋণ দিত। কখনো দরকারমতো রাজস্ব মকুবও করা হতো। আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্বার্থ যেমন দেখা হয়েছিল, কৃষকদের সুবিধার কথাও মাথায় রাখা হয়েছিল। তবে বিদ্রোহী কৃষককে রাষ্ট্র কঠোর সাজা দিত।

ছবি ৫.১১ : অশ্বারোহী শাহ জাহান (মূল রঙিন ছবিটি শিল্পী প্রয়াগের আঁকা)।

মুঘল কারখানায় শুধু বাদশাহের প্রতিকৃতিই আঁকা হতো না, পশু-পাখি এবং উদ্ভিদও আঁকা হতো। এই ছবিগুলি অনেক সময়ই কয়েকজন শিল্পী মিলে তৈরি করতেন। রঙের ব্যবহার আর সূক্ষ্ম কারুকার্যের দক্ষতা দেখা যায় ছবিগুলিতে। [(১) জাহাঙ্গির ও সুফি (শিল্পী : বিচিত্র), (২) চিনার গাছে কাঠবেড়ালি (শিল্পী : আবুল হাসান), (৩) নীলগাই এবং (৪) বহুরূপী (শিল্পী : মনসুর)]

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। **শূন্যস্থান পূরণ করো :** **পূর্ণমান ১**

(ক) ঘর্ঘরার যুদ্ধে বাবরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ______________ (রানা সঙ্গ/ ইব্রাহিম লোদি/নসরৎ খান)।

(খ) বিলগ্রামের যুদ্ধ হয়েছিল ______________ (১৫৩৯/ ১৫৪০/ ১৫৪১) খ্রিস্টাব্দে।

(গ) জাহাঙ্গিরের আমলে শিখ গুরু ______________ (জয়সিংহ/ অর্জুন/ হিমু) কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজপুত নেতাদের মধ্যে মুঘল সম্রাটদের সঙ্গে জোট বাঁধেননি রানা ______________ (প্রতাপসিংহ / মানসিংহ/ যশোবন্ত সিংহ)।

(ঙ) আহমেদনগরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ______________ (টোডরমল/ মালিক অম্বর/ বৈরাম খান)।

২। **নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?** **পূর্ণমান ১**

(ক) বিবৃতি : মুঘলরা তৈমুরের বংশধর হিসাবে গর্ব করত।

ব্যাখ্যা-১ : তৈমুর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তৈমুর এক সময় উত্তর ভারত আক্রমণ করে দিল্লি দখল করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তৈমুর ছিলেন একজন সফাবি শাসক।

(খ) বিবৃতি : হুমায়ুনকে এক সময় ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি নিজের ভাইদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি শের খানের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি রানা সঙ্গের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

(গ) বিবৃতি : মহেশ দাসের নাম হয়েছিল বীরবল।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁর গায়ে খুব জোর ছিল।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি খুব বুদ্ধিমান ছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

(ঘ) বিবৃতি : ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলায় সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি পোর্তুগিজ জলদস্যুদের হারিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি শিবাজিকে পরাজিত করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি বাংলায় বাণিজ্যের উপর কর ছাড় দিয়েছিলেন।

(ঙ) বিবৃতি : আকবরের আমলে জমি জরিপের পদ্ধতিকে বলা হতো জাবতি।

ব্যাখ্যা-১ : জাবত মানে বাজারে শস্যের দাম ঠিক করা।

ব্যাখ্যা-২ : জাবত মানে একমাত্র বাদশাহ কর আদায় করতে পারেন।

ব্যাখ্যা-৩ : জাবত মানে জমির রাজস্ব নির্ধারণ করা।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৩**

(ক) মুঘলরা কেন নিজেদের বাদশাহ বলতো?

(খ) হুমায়ুন আফগানদের কাছে কেন হেরে গিয়েছিলেন?

(গ) ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে কোনো মুঘল অভিজাতদের মধ্যে রেষারেষি বেড়েছিল?

(ঘ) সুলহ-ই কুল কী?

(ঙ) মুঘল শাসন ব্যবস্থায় সুবা প্রশাসনের পরিচয় দাও।

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৫**

(ক) পানিপতের প্রথম যুদ্ধ, খানুয়ার যুদ্ধ ও ঘর্ঘরার যুদ্ধের মধ্যে তুলনা করো। পানিপতের প্রথম যুদ্ধে যদি মুঘলরা জয়ী না হতো তাহলে উত্তর ভারতে কারা শাসন করতো?

(খ) শেরশাহর শাসন ব্যবস্থায় কী কী মানবিক চিন্তার পরিচয় তুমি পাও তা লেখো।

(গ) মুঘল শাসকদের রাজপুত নীতিতে কী কী মিল ও অমিল ছিল তা বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) দাক্ষিণাত্য অভিযানের ক্ষত মুঘল শাসনের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

(ঙ) মুঘল সম্রাটদের কি কোনো নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি ছিল? উত্তরাধিকারের বিষয়টি কেমনভাবে তাঁদের শাসনকে প্রভাবিত করেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) যদি তুমি বাদশাহ আকবরের মতো বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের দেশে সম্রাট হতে তাহলে তোমার ধর্ম নীতি কী হতো?

(খ) মনে করো তুমি সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তাহলে কেমন ভাবে তুমি দাক্ষিণাত্যের সমস্যার মোকাবিলা করতে?

(গ) মনে করো তুমি খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের একজন মারাঠা মনসবদার। তোমার জায়গির থেকে আয় কমে গেছে। এই অবস্থায় মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। তুমি কী করবে? কেন করবে?

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় নগর, বণিক ও বাণিজ্য

৬.১ মধ্য যুগের ভারতের শহর

শহর, নগর শব্দগুলো সবারই জানা। 'নগর' শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার 'শহর' কথাটা ফারসি। সুলতানি ও মুঘল আমলে ভারতে গ্রাম ছিল, আবার ছিল অনেক শহর বা নগর। তার কোনোটা ছিল আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণেও শহর গড়ে উঠত। আবার ধর্মীয় স্থান বা মন্দির-মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কোনো কোনো শহর। এখানে আমরা সেই শহরের ইতিকথাই জানব। কেমনভাবে তৈরি হয় শহর, কেমনভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বা শহরের গুরুত্ব কমে আসে, কখনও বাড়ে। মধ্যযুগের ভারতের শহরগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি আজও আছে, তবে তাদের আকার ও প্রকৃতি অনেক বদলেছে। এই শহরগুলো বেশিরভাগ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। এর মধ্যে আমরা এখানে বেছে নিয়েছি দিল্লি শহরকে। সেই কবে থেকে ভারতের রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে দিল্লি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর বাইরে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য শহর ছিল। যেমন, বাংলার পাণ্ডুয়া, গৌড়, নবদ্বীপ, চট্টগ্রাম, পাঞ্জাবের লাহোর, উত্তর ভারতে আগ্রা, মুঘল সম্রাট আকবরের তৈরি রাজধানী ফতেপুর সিকরি, দাক্ষিণাত্যে বুরহানপুর, গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর এবং পশ্চিমে আহমেদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে আমরা দিল্লি শহরের কথা বিশেষ করে পড়ব।

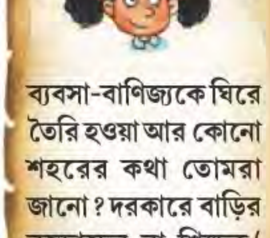

ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘিরে তৈরি হওয়া আর কোনো শহরের কথা তোমরা জানো? দরকারে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

৬.১.১ সুলতানদের রাজধানী দিল্লি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের গোড়া পর্যন্ত

ভৌগোলিকভাবে দিল্লির অবস্থান আরাবল্লি শৈলশিরার একটি প্রান্ত ও যমুনা নদীবিধৌত সমতলের সংযোগস্থলে। এখানে আরাবল্লির পাথর দিয়ে জমির ঢাল অনুযায়ী সুরক্ষিত দুর্গনির্মাণ করা সহজ ছিল। আবার, যমুনা নদী এখানে প্রধান জলপথ এবং শহরের পূর্ব দিকের প্রাকৃতিক সীমানা। ফলে বহু যুগ ধরেই একদিকে রাজারাজড়া, অন্যদিকে বণিকবৃন্দ এই অঞ্চলটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

টুকরো কথা

অনেক কালের দিল্লি

দিল্লি শহরটি অনেক বার ভাঙা-গড়া হয়েছে। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি নগরের কথা আছে। তাকেই কেউ কেউ আধুনিক দিল্লি নগরীর আদি রূপ মনে করেন। মৌর্য শাসকদের জনৈক বংশধরের আমলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে দিল্লির নাম পাওয়া যায়। এর অনেক কাল পরে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে রাজপুত শাসকদের একটি গোষ্ঠী দিল্লিতে শাসন করত। তাদের হঠিয়ে চৌহান রাজপুতরা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে দিল্লি দখল করে নেয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মহম্মদ ঘুরির সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্যন্ত মধ্য যুগের দিল্লির সাতটি নাগরিক বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

মধ্য যুগে দিল্লি শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের দুটি পর্যায় ছিল। একটি হলো খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের দিল্লি, অপরটি হলো সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের তৈরি শাহজাহানাবাদ। এখানে আমরা এই দুই পর্যায়ে দিল্লি শহর কেমন ভাবে বদলে গেছে তার কথা পড়ব।

কুতুবউদ্দিন আইবকের আমলে দিল্লি তৈরি হয়েছিল রাজপুত শাসকদের শহর কিলা রাই পিথোরাকে কেন্দ্র করে। এটাই ছিল সুলতানি আমলের প্রথম দিল্লি বা কুতুব দিল্লি। পরবর্তী কালে গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে গিয়াসপুর নামে একটি শহরতলি তৈরি হয়েছিল যমুনার পারে। বলবনের পৌত্র কায়কোবাদ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষে যমুনার তীরে কিলোঘড়ি প্রাসাদ তৈরি করেন। জালালউদ্দিন খলজির আমলে একে ঘিরেই 'নতুন শহর' (*শহর-ই নও*) তৈরি হয়। এই শহরে আমির ও সর্দার শ্রেণির লোকেরা এসে ভিড় করে। তাদের সঙ্গে ছিল গায়ক ও বাজনাদার মানুষজন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সিরিতে শক্তপোক্ত কেল্লা শহর বানানো হয়েছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক অনুচরদের নিয়ে বসবাসের জন্য 'পুরোনো শহর' থেকে দূরে বানিয়েছিলেন তুঘলকাবাদ। তবে সেটি কখনই পুরোপুরি একটি রাজধানী বা বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে কুতুব দিল্লি, সিরি ও তাঁর নিজের তৈরি জাহানপনাহকে একটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে বৃহত্তর শহর হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। এত কিছুর মধ্যে কিন্তু সুলতানি আমলের প্রথম দিল্লি (কুতুব দিল্লি বা পুরোনো দিল্লি) কখনই গুরুত্ব হারায় নি।

মানচিত্র ৬.১ : দিল্লির সাতটি শহর

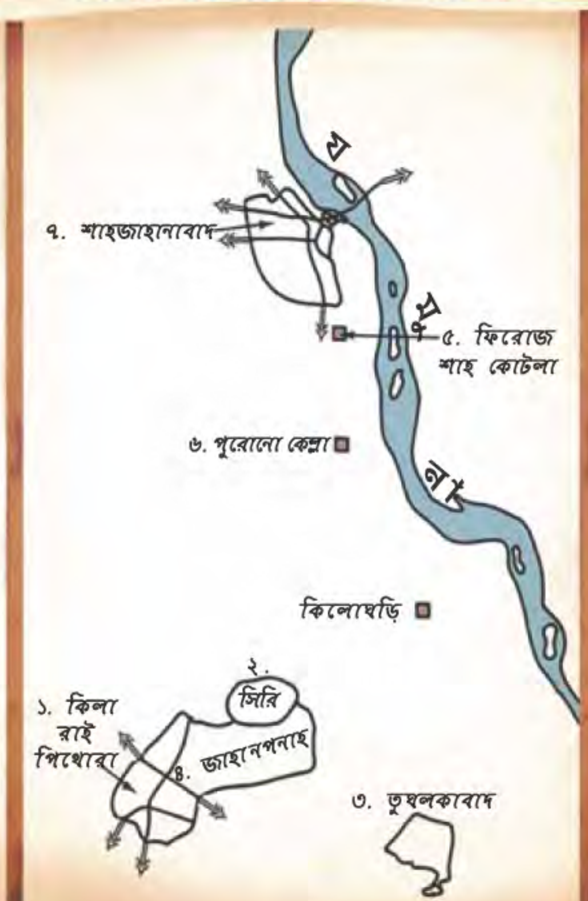

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

টুকরো কথা

ইলতুৎমিশের 'নতুন শহর'

সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে (১২১১-'৩৬ খ্রিঃ) দিল্লি শহর গড়ে ওঠার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক ইসামি। তিনি লিখেছেন যে, প্রদীপের আলোকশিখার চারপাশে যেমন ভাবে পতঙ্গের ভিড় জমে ওঠে, তেমনি আরব, ইরান, চিন, মধ্য এশিয়া বা বাইজানটাইন থেকে অভিজাত ব্যক্তি, নানা ধরনের শিল্পী-কারিগর, চিকিৎসক, রত্ন-ব্যবসায়ী, সাধু-সন্ত সকলেই এসে ভিড় করল ইলতুৎমিশের 'নতুন শহর'-এ।

শহরের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	রাজবংশ	সময়
১. কিলা রাই পিথোরা	পৃথ্বীরাজ	চৌহান (রাজপুত)	আনুমানিক ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ
২. সিরি	আলাউদ্দিন খলজি	খলজি (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ
৩. তুঘলকাবাদ	গিয়াস উদ্দিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২১ খ্রিস্টাব্দ
৪. জাহানপনাহ	মহম্মদ বিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ
৫. ফিরোজাবাদ (ফিরোজ শাহ কোটলা)	ফিরোজ শাহ তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. দীন পনাহ, শেরগাহ (পুরোনো কেল্লা)	হুমায়ুন শেরশাহ	মুঘল সুর (আফগান)	আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ
৭. শাহজাহানাবাদ	শাহ জাহান	মুঘল	আনুমানিক ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লিতে সুলতানি শাসন যখন একটু-একটু করে বেড়ে উঠেছে, সে সময় মধ্য এশিয়ায় এক দুর্ধর্ষ জাতি ছিল মোঙ্গলরা। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই মোঙ্গলরা ইরাকের বাগদাদ শহরের অনেক ক্ষতি করেছিল। বাগদাদ ছিল মুসলমান সভ্যতার এক বড়ো কেন্দ্র। বাগদাদের দুরবস্থার ফলে দিল্লির গুরুত্ব বেড়ে যায়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে অনেক লোক এসে বাস করতে শুরু করে দিল্লিতে। দিল্লি হয়ে ওঠে সুফি সাধকদের অন্যতম পীঠস্থান। এজন্য দিল্লির নামই হয়ে গিয়েছিল *হজরত-ই দিল্লি*। সুফি সাধকদের মধ্যে সেই সময়ে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া। সুফি সাধকদের কথা আমরা পড়বো সপ্তম অধ্যায়ে।

ভেবে দেখোতো এই দিল্লি শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কেন?

টুকরো কথা

দিল্লি এখনও অনেক দূর

দিল্লি শহর নিয়ে গল্পের শেষ নেই। এর মধ্যে একটি বিখ্যাত গল্প শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে (শাসনকাল ১৩২০-'২৪ খ্রিঃ) নিয়ে। একবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে শহরের বাইরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তাতেও নিজামউদ্দিন দমে যাননি। এরপর সুলতান এক যুদ্ধযাত্রায় গেলেন বাংলাদেশে। যাওয়ার সময়ে হুকুম করলেন যে, তিনি রাজধানীতে ফেরার আগেই যেন নিজামউদ্দিন পাকাপাকিভাবে শহর ছেড়ে চলে যান। নিজামউদ্দিনের শিষ্যরা তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিজামউদ্দিন তাঁদের শুধু বললেন, 'হনুজ দিল্লি দূর অস্ত' (দিল্লি এখনও অনেক দূর)। যুদ্ধযাত্রা থেকে ফেরার পথে সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি একটি মঞ্চ শামিয়ানাসুদ্ধ ভেঙে পড়ে। এতে চাপা পড়ে গিয়াসউদ্দিন মারা যান। সুলতানের আর রাজধানীতে ফেরা হলো না। এই ঘটনায় দিল্লিতে নিজামউদ্দিনের জয়জয়কার ঘোষিত হলো।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লি শহরের চেহারা বদলে যায়। আগেকার মতো আরাবল্লির পাথুরে এলাকায় শহর তৈরি না করে ফিরোজ তুঘলক যে ফিরোজাবাদ শহর গড়লেন তার মধ্যমণি ছিল ফিরোজ শাহ কোটলা। কোটলা মানে দুর্গ। এই শহর ছিল যমুনা নদীর পাড় বরাবর। এই পরিকল্পনার ফলে শহরে জলের সমস্যা মেটানো গেল। নদীপথে বয়ে আনা জিনিসপত্র শহরের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হলো ও তার জন্য খরচও কমল। সুলতানদের পুরোনো দিল্লি শহর আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে লাগল। ফিরোজাবাদের পত্তনের ফলে এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ফিরোজ তুঘলক দিল্লিতে শহর

পত্তনের ধাঁচটি বদলে দিয়েছিলেন। এর পর থেকে নদীর ধারেই আফগান ও মুঘলরা তাদের একাধিক কেল্লা ও শহর বানিয়েছিল।

সুলতানি আমলের দিল্লিতে অনেকগুলো বাজারের কথা জানা যায়। এখানে দেশ-বিদেশের বণিকরা নানা ধরণের পণ্য নিয়ে আসত। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পরে আরও বেশি করে জানব। (**৬.২ একক দেখো**)

দিল্লি শহরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর মিশ্র ধরনের বসতি। এখানে কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে বসতি গড়ে ওঠেনি। সাধারণত একই পেশার কারিগররা জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে কাজের টানে একসাথে একটি মহল্লায় থাকত। শহরের গড়নের মধ্যে সবসময় পরিকল্পনার ছাপ বিশেষ ছিল না। কয়েক দশক পর-পর শহরের অবস্থান বদলে যাওয়ায় জাত-পাত-ভিত্তিক মহল্লা গড়ে ওঠার সুযোগও ছিল কম। শহরের আশেপাশে গড়ে উঠেছিল *কসবা* বা শহরতলি। এগুলোকে ছোটো শহরও বলা চলে। কসবাগুলো শহরের মতো পাঁচিলঘেরা হতো না। গ্রাম ও শহরতলির সীমানাও নির্দিষ্ট ছিল না।

দিল্লি শহরের প্রধান সমস্যা ছিল জলের অভাব। অত লোকের জন্য বর্ষার জল ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সুলতানরা কয়েকটি *হৌজ* বা পুকুর খুঁড়ে দিলেও জলের সমস্যা থেকেই যায়। কাজেই শহর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে যমুনা নদীর দিকে। নদী ঘন ঘন খাত পরিবর্তন করলে জলের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। সুলতান ফিরোজ শাহ শহরে জল আনার জন্য খাল কেটেছিলেন। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও শহরে জলাভাব ও স্থানাভাব দেখা দেয়।

টুকরো কথা

সুলতানি আমলে জলসংরক্ষণ ও জল সরবরাহ

'হৌজ' বা 'তালাও' (জলাধার) ছিল দিল্লি শহরের জল সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুশাসনের প্রতীক হিসাবে জনসাধারণের জন্য সুলতানরা জলাধার খনন করতেন ও সংস্কার করতেন। সুলতান ইলতুৎমিশ খনন করেছিল 'হৌজ-ই শামসি' বা 'হৌজ-ই সুলতানি'। আটকোণা এই জলাধারের বর্ণনা দিয়েছেন ইবন বতুতা। আলাউদ্দিন খলজি খনন করেন আরও বড়ো চারকোণা জলাধার 'হৌজ-ই আলাই '। পরে এর নাম হয় হৌজ-ই খাস। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নতুন বানানো তুঘলকাবাদে আরেকটি জলাশয় তৈরি করেন, যেখানে উঁচু বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হতো। উল্টোদিকে, সুলতানি রাষ্ট্রের বিরোধী স্থানীয় শক্তি শহরের অধিবাসীদের বিপাকে ফেলার জন্য 'হৌজ-ই শামসি'র নালাগুলোর উপর বাঁধ দিয়ে দিত। গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে মেও দস্যুদের ভয়ে শহরের লোকজন জল আনতে তালাও পর্যন্ত যেতে পারত না। ফিরোজ তুঘলক এইসব নালার ওপর তৈরি বাঁধ ভেঙে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করেন।

যে এলাকায় তুমি থাকো সেখানকার বাজার-হাট কেমন? তার সঙ্গে সুলতানি ও মুঘল আমলের দিল্লির বাজারের কী কী মিল-অমিল দেখতে পাওয়া যাবে?

ছবি ৬.১ : হৌজ-ই খাস জলাশয় (দক্ষিণ দিল্লি)। পিছনে মাদ্রাসা ও সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সমাধি সৌধ।

ভেবে দেখোতো মধ্যযুগের শহরে মাটির ওপরের জলাধারগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন? তোমার স্থানীয় অঞ্চলে পানীয় জল কীভাবে পাওয়া যায়?

দিল্লির সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন পথ ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দিল্লি ও দৌলতাবাদের মধ্যে পথ বানানো হয়। কিন্তু এই সব পথের ওপর মেও এবং জাঠরা হানা দিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দিত। সুলতানরা চেষ্টা করতেন পথগুলো খোলা রাখার।

সুলতানি শাসনের সাড়ে তিনশো বছরে দিল্লির শাসকরা এগারো বার তাঁদের শাসনকেন্দ্র বদলিয়েছেন। এর ফলে কোন জায়গাতেই স্থায়ীভাবে শহরটির ভিত মজবুত হয়নি। সুলতানদের দিল্লি মোটামুটি ভাবে তিনশো বছর টিকে ছিল। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দর লোদির সময়ে আগ্রা শহরের বিকাশ শুরু হয়। সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজধানী চলে আসে আগ্রাতে। এরপর প্রায় একশো তিরিশ-চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে দিল্লি শহরের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে এসেছিল। যদিও সুফি সাধকদের ঐতিহ্যের কেন্দ্র হিসাবে এই শহর হিন্দুস্তানের জনজীবনে বরাবরই মর্যাদা পেয়ে এসেছিল।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পানিপতের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে আগ্রা ও দিল্লি উভয়ই দখল করেছিলেন। শেরশাহর শাসনকালে যমুনার পশ্চিমদিকে *কিলা-ই কুহনা* (পুরোনো কেল্লা) ছিল রাজধানী। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে মুঘল বাদশাহ শাহ জাহানের সময়ে যমুনা নদীর পশ্চিমে শাহজাহানাবাদ নগরের পত্তন হলে দিল্লি পুনরায় রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে সরগরম হয়ে ওঠে।

টুকরো কথা

দিল্লি সুলতানি আর মুঘল সাম্রাজ্য

বিশ্বের বড়ো-বড়ো সাম্রাজ্যগুলো সাধারণত কোন একটি রাজবংশের নাম দ্বারা পরিচিত। যেমন ভারতের মৌর্য, গুপ্ত, চোল, মুঘল বা চিনের মাঞ্চু। তেমনই ইরানের সফাবি, তুরস্কের অটোমান, ইউরোপে ফ্রাঙ্ক, হ্যাপসবার্গ, রোমানভ। মেক্সিকোর আজটেক ও দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সাম্রাজ্যগুলোও কোনো-না-কোনো রাজবংশের নামে পরিচিত। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন প্রাচীন বিশ্বে এথেন্স বা রোম শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য। তেমনই দিল্লির সুলতানি বা বিজয়নগরের সাম্রাজ্যগুলিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এইসব ক্ষেত্রে 'রোম সাম্রাজ্য' বা 'দিল্লি সুলতানি' নামটাই থেকে গেছে। দিল্লি সুলতানিতে যে রাজবংশই ক্ষমতায় আসুক না কেন শহরটির গুরুত্ব কমেনি। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে যেমন বারবার শাসনকেন্দ্র বদলেছে, দিল্লি সুলতানিতে তা হয়নি। সবকটি শাসকবংশ দিল্লিকেই তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র বানিয়েছে।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র : আগ্রা-ফতেহপুর সিকরি-লাহোর

আকবরের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যে শাসনকেন্দ্র বারবার বদলেছে। দিল্লি সুলতানির মতো এখানে কোনো ভৌগোলিক এলাকা ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল না। মুঘল শাসক কোথায় অবস্থান করেছেন সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল আমলে আগ্রা, ফতেহপুর সিকরি এলাহাবাদ ও লাহোর প্রত্যেকটি শহরই ছিল অতি সুরক্ষিত, প্রায়-দুর্ভেদ্য দুর্গনগরী অথবা শাসনকেন্দ্র। শেখ সেলিম চিশতির স্মৃতিধন্য সিকরি গ্রামে আকবর তৈরি করেন নতুন রাজধানী ফতেহপুর। তবে আগ্রা দুর্গশহর হওয়ায় কখনই এর গুরুত্ব কমেনি। জলের অভাবে ফতেহপুর সিকরি ছেড়ে আকবর লাহোর চলে যান ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে। যেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নজর রাখাও বেশি সুবিধাজনক ছিল। ফের ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগ্রা থেকেই মুঘল শাসন পরিচালনা করা শুরু হয়।

গঙ্গা ও যমুনার সন্ধিস্থলে বানানো এলাহাবাদ দুর্গ থেকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের ওপর নজরদারি করা যেত। রাজপুতানার আজমের ও উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদের পারে তৈরী আটক দুর্গ ও তার কিছুটা পূর্বদিকে রোহ্‌টাস দুর্গ ছিল অবস্থানগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রগুলোর সাহায্যে সিন্ধু-যমুনা-গঙ্গা অববাহিকার সুবিশাল, উর্বর, সমতল অঞ্চলের জনগণ, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ধনসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যেত।

আকবরের আমলে বুন্দেলখণ্ডের প্রধান দুর্গনগরী গোয়ালিয়র, রাজপুতানার চিতোর ও রনথম্ভোর এবং দাক্ষিণাত্যের অসিরগড় দুর্গও মুঘলরা দখল করেছিল। তবে হিন্দুস্তানের (উত্তর ভারতের) দুর্গগুলোই ছিল মুঘলদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র।

৬.১.২ শাহজাহানাবাদ : মুঘল-রাজধানী : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক

দিল্লিতে সুলতানি আমলে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের থেকে খানিকটা দূরে যমুনা নদীর পশ্চিমে একটি উঁচু জায়গায় শাহজাহানাবাদ গড়ে উঠেছিল। বাদশাহ শাহ জাহান সুলতানদের আমলের দিল্লি শহরের ধ্বংসাবশেষকে রাজধানী হিসাবে বেছে নেননি। তিনি একটি নতুন এলাকায় শহর পত্তন করে সার্বভৌম শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই শহর বানানোর সময় ইসলামি ও হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মুঘল শাসকরা ততদিনে ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন।

টুকরো কথা

মুঘলদের রাজধানী বদল : আগ্রা থেকে শাহজাহানাবাদ দিল্লি

যমুনা নদীর পাড় ভেঙে আগ্রা শহর ক্রমশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শহরের পথঘাটও ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে। আগ্রার প্রাসাদদুর্গ মুঘল বাদশাহের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য আর যথেষ্ট বড়ো ছিল না। তাই তৈরি করা হলো ***শাহজাহানাবাদ*** *(শাহ জাহানের শহর)। এতে ভারতের রাজনীতিতে দিল্লি শহরের যে গুরুত্ব তাকেও স্বীকার করা হলো। শাহজাহানাবাদ তৈরি হয়েছিল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে শাহ জাহান আগ্রা থেকে সেখানে চলে আসেন।*

চাঁদনি চকের গল্প

লালকেল্লা থেকে জাহান আরা বেগমের চক পর্যন্ত বিস্তৃত বাজারের উত্তর দিকে একটি সরাইখানা ও বাগান এবং দক্ষিণে একটি স্নানাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন শাহ জাহানের কন্যা জাহান আরা। জনশ্রুতি হলো, চাঁদনি রাতে জলে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করত বলে ওই জায়গার নাম হয়েছে ***চাঁদনি চক****। আবার, এও গল্প আছে যে ওই বাজারে সোনা-রুপোর টাকার ঝিলিকের জন্য চাঁদনি চক নামটি তৈরি হয়েছে।*

এই শহরের মুখ্য স্থাপত্যগুলো হলো লাল রঙের বেলে পাথরে তৈরি *কিলা মুবারক* ('লালকেল্লা' নামেই বিখ্যাত) ও জামা মসজিদ। শাহজাহানাবাদ শহরকে ঘিরে একটি খুব উঁচু ও বিরাট পাথরের পাঁচিল তৈরি করা হয়েছিল। এর গায়ে সাতাশটা বুরুজ (স্তম্ভ) ও অনেকগুলো ছোটোবড়ো দরজা বানানো হয়েছিল, যায় মধ্যে সাতটা বড়ো দরজা ছিল। বড়ো দরজাগুলো আজও আছে।

টুকরো কথা

দিল্লির লালকেল্লা

লালকেল্লার আয়তন আগ্রা দুর্গের দ্বিগুণ। এর পূর্বদিকে যমুনা নদী এবং পশ্চিমে পরিখা। দুর্গের চারটি বড়ো দরজা, দুটি ছোটো দরজা ও একুশটি বুরুজ ছিল। দুর্গের মধ্যে একভাগে ছিল রাজপরিবারের বাসস্থান, অন্য দিকে বিভিন্ন দপ্তর। সেই সময়ে ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে এটি বানানো হয়েছিল। দুর্গ ও শহরের মধ্যে নালা দিয়ে সেকালে জল বয়ে যেত। এই জলবাহী নালাগুলোকে বলা হতো 'নেহর-ই বিহিশ্‌ত' (স্বর্গের খাল)। ইসলামি রীতি অনুযায়ী এগুলোকে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রতীক ভাবা হতো।

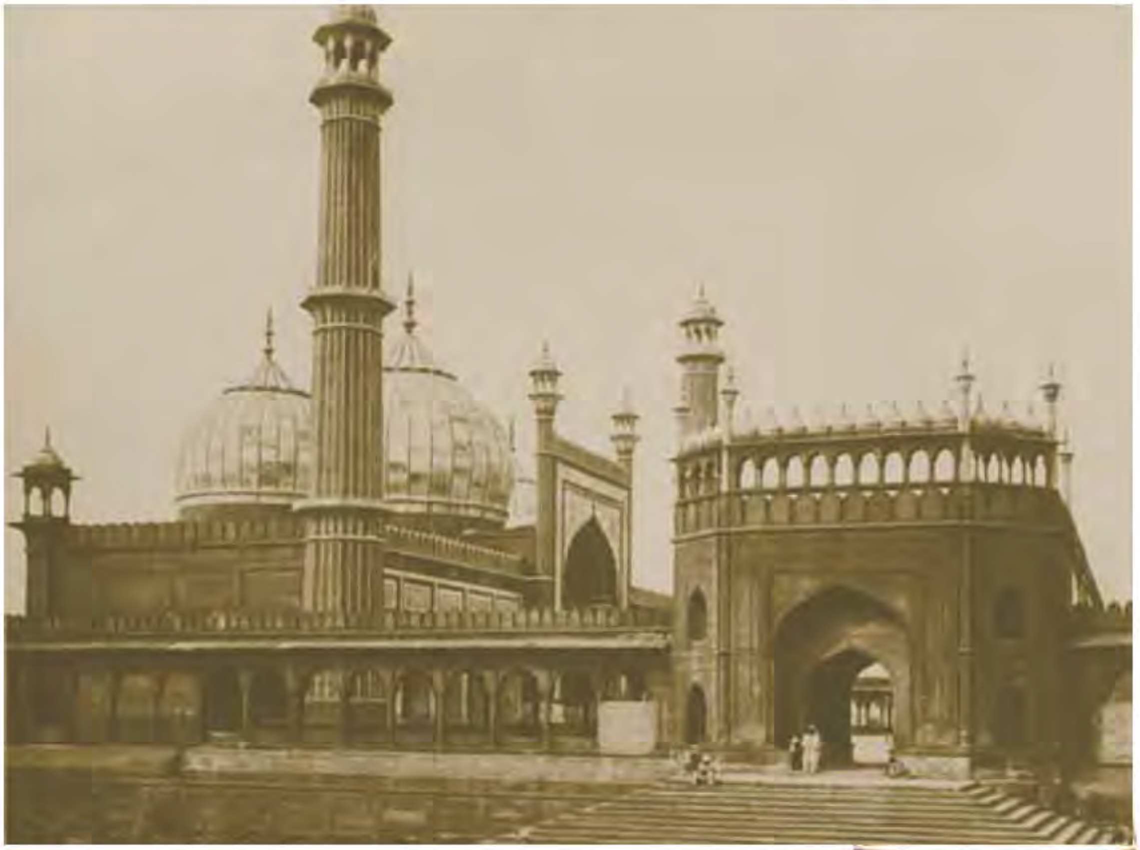

ছবি ৬.২ : মসজিদ-ই জাহান-নুমা (জামা মসজিদ), পুরানো দিল্লি। এই ছবিটি আনুমানিক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি আলোকচিত্র।

শাহজাহানাবাদেরও নাগরিক বসতি ছিল মিশ্র প্রকৃতির। এখানে নানা শ্রেণির মানুষ বসবাস করত নানা ধরনের বাড়িতে। রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ আমিররা সুন্দর বাগানবাড়িতে থাকত। ধনী বণিকরা টালি দিয়ে সাজানো ইট ও পাথরের বাড়িতে থাকত। সাধারণ ব্যবসায়ীরা থাকত নিজেদের দোকানের ওপরে বা পেছন দিকের ঘরে। সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর বাড়িগুলোকে বলা হতো *হাভেলি*। এর থেকে নীচুস্তরের বাড়িকে *মকান* ও *কোঠি* বলা হতো। সবচেয়ে ছোট ঘরকে বলা হতো *কোঠরি*। এ ছাড়া ছিল আলাদা বাংলো বাড়ি। বড়ো বড়ো বাড়ির অশেপাশে মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি বহু ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর ছিল। এই সব কুঁড়েতে সাধারণ সৈনিক,দাসদাসী, কারিগর প্রমুখ মানুষজন থাকত। কুঁড়েতে আগুন লেগে মাঝে-মধ্যে অনেক লোক ও গবাদি পশু মারা যেত বলে জানা যায়। তবে বসতি এলাকার মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। উচ্চপদস্থ আমির ও গরিব কারিগর একই মহল্লায় পাশাপাশি থাকত। শাহজাহানাবাদের প্রধান রাজপথ ছিল দুটি। রাজপথকে *বাজার* বলা হতো, কারণ তার দু-পাশে সারিবন্ধ দোকান ছিল।

কোনো কোনো উৎসবে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে লোক এক হয়ে পরব উদ্‌যাপন করত। যেমন দেওয়ালির সময় হিন্দু-মুসলমান একইসঙ্গে দিল্লির প্রখ্যাত সুফি সাধক শেখ নাসিরউদ্দিন 'চিরাগ-ই দিল্লি'-র (দিল্লির প্রদীপ) দরগায় আলোর উৎসব পালন করত। মহরমে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় যৌথ ভাবে অংশ নিত।

শাহজাহানাবাদ রাজধানী শহর হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তার কিছু কিছু অবশেষ আজও রয়ে গেছে। সুলতানি রাজধানীগুলোর থেকে এর আয়ু ছিল বেশি। এর থেকে মনে হয় যে শাসক হিসাবে মুঘলরাও স্থায়িত্ব অর্জন করতে পেরেছিল।

৬.২ বণিক ও বাণিজ্য

এবারে আমরা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেকার ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পড়ব। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের পসরা সাজিয়ে বাণিজ্য করেছে। সেকালে রেলপথ বা আকাশপথে যাতায়াতের সুযোগ ছিল না। সড়কপথ ও জলপথই ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। এই সব পথ অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম হতো, পথে-ঘাটে নানা রকম বিপদ-আপদের আশঙ্কাও ছিল। তা সত্ত্বেও বণিকরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভারবাহী পশুর পিঠে করে, কিংবা পালতোলা নৌকা ও জাহাজে করে মালপত্র নিয়ে যেত বেচাকেনার জন্য। এই সব বণিকদের মধ্যে যেমন ভারতীয় বণিকরা ছিল, তেমন ভারতের বাইরে থেকেও অনেক ভিনদেশী বণিক ভারতে আসত বাণিজ্য করার জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্যপথের ধারে,নদী কিংবা সমুদ্রের পাড়ে গড়ে উঠেছিল নানা হাট, মণ্ডি, গঞ্জ, ছোটো-বড়ো শহর।

দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। এর নানা কারণ ছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দিল্লির সুলতানরা কয়েকটি নতুন শহর তৈরি করেন বা পুরানো শহরগুলোতে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। নানা ধরনের মানুষজনের আসা-যাওয়ার ফলে কেমনভাবে মধ্য যুগের ভারতে শহর গড়ে উঠেছিল তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তখনকার দিনের লেখাপত্রে। এই সব শহরে সুলতানরা ও তাঁদের অভিজাতরা, সৈনিকরা ও সাধারণ মানুষ বসবাস করতে শুরু করলে শহরগুলি জনবহুল হয়ে ওঠে। শহরের প্রাসাদ, মসজিদ,বাজার,রাস্তাঘাট, সরাইখানা, স্নানাগার, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি তৈরি করতে অনেক কাঁচামাল ও শ্রমিক দরকার হতো। এইসব শ্রমিকরা ছিলেন নানান জাত ও ধর্মের মানুষ। এরা কেউ ভারতীয়,কেউ বা ভারতের বাইরে থেকে আসা লোক। অনেক শ্রমিক ছিল যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হওয়া দাস।

শহরগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও বাড়ি-ঘর তৈরির কাঁচামালের জোগান দেওয়ার জন্য আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

আবার, সে যুগে সুলতানরা তাঁদের সামরিক প্রয়োজনে বিরাট সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকে এদের ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে নগদে কর আদায় করত। ওই নগদ টাকা জোগাড় করার জন্য কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁদের উৎপন্ন শস্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতো। সেই শস্য নিয়েও বাণিজ্য চলত। তা ছাড়া, সুলতান ও অভিজাতদের বিলাস-ব্যসনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা সে যুগের বাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

৬.২.১ দেশের ভেতরের বাণিজ্য

দেশের ভিতরে সাধারণত দুই ধরনের বাণিজ্য হতো। প্রথমত, গ্রাম ও শহরের বাণিজ্য এবং দ্বিতীয়ত, দুটি শহরের মধ্যেকার বাণিজ্য। জনবহুল শহরগুলোর অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রাম থেকে শহরে যে সব পণ্য রপ্তানি হতো সেগুলি কমদামি জিনিস, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে এই সব জিনিস গ্রাম থেকে শহরে আসত। এই সব জিনিসপত্রের মধ্যে থাকত নানা রকমের খাদ্যশস্য, খাবার তেল, ঘি, আনাজ, ফল, লবণ ইত্যাদি। শহরের বাজারে এইসব পণ্য বিক্রি হতো।

যে সব জিনিসের কথা এখানে বলা হলো তার মধ্যে কোন কোন জিনিস এখনও কেনা-বেচা হয়?

আবার এক শহর থেকে আরেক শহরে রপ্তানি হতো প্রধানত বেশি দামের শৌখিন জিনিসপত্র,যেগুলো ধনী,অভিজাতদের জন্যই তৈরি করত কারিগররা। এ সব জায়গায় সব জাতির ও সব ধর্মের মানুষরাই কাজ করত শিল্পী ও কারিগর হিসাবে। সুলতানদের রাজধানী দিল্লি শহরে সাম্রাজ্যের নানা এলাকা থেকে দামি মদ, সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র আমদানি করা হতো। তা ছাড়া বাংলাদেশ, করমণ্ডল ও গুজরাতের সুতি ও রেশমের কাপড়ের চাহিদা ছিল দেশের সর্বত্র। এই যুগে প্রথম চরকায় সুতো কেটে কাপড় বোনা শুরু হয়েছিল।

সুলতানি যুগে অন্যান্য হস্তশিল্পের বাণিজ্যও হতো। এর মধ্যে ছিল চামড়া, কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি জিনিস, গালিচা ইত্যাদি। এই যুগেই ভারতে প্রথম কাগজ তৈরি করা শুরু হয়। এক সময় দেখা গেল যে, দিল্লির মিঠাইওয়ালারা কাগজের মোড়কে করে মিঠাই বিক্রি করতে শুরু করেছে।

এই সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছিল। রাস্তার ধারে-ধারে পথিকদের জন্য গড়ে উঠেছিল সরাইখানা। এগুলোতে পথচারী ও বণিকরা তাদের মালপত্রসহ বিশ্রাম নিত। কর আদায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের

সুবিধার জন্য দিল্লির সুলতানরা 'তঙ্কা' (রুপোর মুদ্রা) ও 'জিতল' (তামার মুদ্রা) নামে দু-ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন। এগুলোর মান ছিল যথেষ্ট ভালো।

টুকরো কথা
টাকাকড়ির কথা

সুলতানি আমলে প্রধান মুদ্রা ছিল সোনার মোহর, রুপোর তঙ্কা ও তামার জিতল। ওই আমলের শেষদিকে উত্তর ভারতে চলত এক রকমের রুপো এবং তামা মেশানো মুদ্রা। শের শাহ সোনা, রুপো ও তামা এই তিন রকমের মুদ্রা চালু করেন, যা পরে মুঘল সম্রাটরাও অনুসরণ করেছিল।

মুঘল আমলের সোনার মুদ্রা 'মোহর' বা 'আশরফি' নামে পরিচিত ছিল। এ যুগে প্রধান মুদ্রা ছিল রুপো দিয়ে তৈরি 'রুপায়া'। এটা দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য হতো প্রজারা কর দিত। এ ছাড়া ছিল তামা দিয়ে তৈরি মুদ্রা 'দাম'। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে সোনা দিয়ে তৈরি 'হোন' ছিল প্রধান মুদ্রা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরে দাক্ষিণাত্যের অন্য রাজ্যেও এই নামের মুদ্রা চালু ছিল।

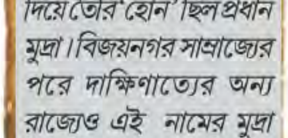

৬.২.২ দেশ ও বিদেশের বাণিজ্য

ভারতে তৈরি জিনিসের চাহিদা ছিল ভারতের বাইরের নানা দেশে। বাণিজ্য হতো জলপথে ও স্থলপথে। গুজরাট ও মালাবারের (কেরালা) বন্দরগুলো থেকে পশ্চিমদিকে আরব সাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশে যেত প্রধানত বস্ত্র, মশলা, নীল ও খাদ্যশস্য। সুলতানি আমলে যুদ্ধবন্দী দাসদেরও ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়াতে রপ্তানি করা হতো। আবার, ওই সব দেশ থেকে আসত ঘোড়া, কাচের তৈরি সামগ্রী, সাটিন কাপড় ইত্যাদি। সব ভারতীয় শাসকই ঘোড়া আমদানিতে উৎসাহ দিত, কারণ ভারতে ভালো মানের ঘোড়া জন্মাত না। প্রধানত পারস্য, এডেন ও ইয়েমেন থেকে ভারতে ঘোড়ার আমদানি হতো। সুলতানি আমলে এবং মুঘল আমলের প্রথম দিকে গুজরাটের ব্রোচ ও ক্যাম্বে বন্দরদুটি এই বাণিজ্যের প্রবেশপথ ছিল। আলাউদ্দিন খলজি গুজরাট জয় করলে দিল্লি সুলতানির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের থেকে বিশেষ ধরনের কাপড়, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ ওই সব দেশে রপ্তানি হতো। মুঘল আমলে সুরাট বন্দর ছিল ভারতের প্রধান বন্দর। এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ভালো যোগাযোগ ছিল।

পূর্বদিকে ভারতীয় সামগ্রীর চাহিদা ছিল বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের দেশগুলিতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। গুজরাট থেকে ওই সব দেশে যেত রঙিন কাপড়, বাংলা থেকে রপ্তানি হতো সুতির কাপড়, রেশমবস্ত্র ও চিনি। এর বিনিময়ে গুজরাটে আসত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা। মালদ্বীপ থেকে আমদানি করা কড়ি ওই যুগে বাংলায় মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই ভাবে ভারতের বিভিন্ন উপকূল থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

সড়কপথে ভারতীয় সামগ্রীর ব্যবসা হতো প্রধানত মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে। মুলতান শহর ছিল এই বাণিজ্যের কেন্দ্র। সড়কপথে মধ্য এশিয়া থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রুপো ও রত্ন আমদানি হতো। মুদ্রা তৈরিতে ওই সব মূল্যবান ধাতুর চাহিদা ছিল। তাছাড়া, অলংকারের জন্যও ঐ ধাতুগুলির চাহিদা ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাক ও চিন থেকে আসত ব্রোকেড ও রেশম। এই পণ্যগুলি ছিল মূল্যবান এবং এর চাহিদা ছিল সমাজের উঁচু তলার মানুষের কাছে।

ভারতীয় বাণিজ্যের জগৎ

বণিক

করওয়ানি, নায়ক, বনজারা-রা শস্য পরিবহণ করে নিয়ে আসত। শাহ বা মুলতানিরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে দক্ষ ছিল। এরা সুদের কারবারও করত। মুলতানিরা বেশির ভাগই ছিল হিন্দু, তবে মুসলমান বণিকদের কথাও জানা যায়। বড়ো-বড়ো বণিক গোষ্ঠী ছাড়াও অনেক ছোটো ফেরিওয়ালাও ছিল। এমনকি সুফি সাধকদের মধ্যেও কেউ কেউ ছোটোখাটো ব্যবসা করতেন।

সরাফ

এরা আজকের ব্যাঙ্কের মতো সেকালে টাকা বিনিময়ের কাজ করত। এরা ধাতুর মুদ্রা কতটা খাঁটি তা-ও পরীক্ষা করে দেখে নিত।

দালাল

এরা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখত, জিনিসের দাম ঠিক করে দিত।

বিমা ব্যবস্থা

ব্যবসায়ীরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে ঝুঁকি নিয়ে পণ্য পাঠাতে পারত।

এবারে ভেবে দেখোতো যে এই বিরাট ও বিচিত্র বাণিজ্য-জগতের মানুষজন কারা ছিল? শ্রেণিকক্ষে চারজনের দল করো। এবারে ধরো তোমাদের একজন বণিক, একজন সরাফ, একজন দালাল ও একজন ক্রেতা। জিনিস কেনা-বেচা নিয়ে তোমাদের চারজনের মধ্যে কেমন কথাবার্তা হবে তা চারজনেই লিখে/অভিনয় করে দেখাও।

টুকরো কথা

হুন্ডি

*তুর্কি শাসকদের আমলে কাগজের ব্যবহার শুরু হলে সরাফরা **'হুন্ডি'** নামে এক ধরনের কাগজ চালু করেছিল। বণিকরা কোন এক জায়গায় সরাফকে টাকা জমা দিয়ে সেই কাগজ কিনে নিয়ে অন্য জায়গায় তা প্রয়োজন মতো ভাঙিয়ে নিত। এতে বণিকদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টাকা নিয়ে যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল।*

ছবি ৬.৩ : মধ্য যুগের আফগানিস্তানের একটি বাজারে বাদাম বেচা-কেনা হচ্ছে। *বাবরনামা*-র ছবি।

মধ্যযুগে সমুদ্র বাণিজ্যে নানা দেশের বণিকরাই অংশগ্রহণ করত। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে গুজরাটি, মালাবারি, তামিল, ওড়িয়া, তেলুগু ও বাঙালি বণিকরা সুনাম অর্জন করেছিল। এই বণিকরা ধর্মে ছিল হিন্দু, মুসলমান ও জৈন। এরা আরব, পারসিক ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। এদের মধ্যে কোনো কোনো বণিক ছিল খুব ধনী, তাদের বলা হতো বণিক-সম্রাট। বড়ো বড়ো ভারতীয় বণিকদের নিজস্ব জাহাজ থাকত। বাকিরা অন্যদের জাহাজে করে জিনিসপত্র পাঠাত।

টুকরো কথা

যুদ্ধ ও বাণিজ্য

মুঘল সম্রাট আকবরের আমলের একজন পোর্তুগিজ যাজক ফাদার আন্তোনিও মনসেরাট মুঘলদের একটি যুদ্ধযাত্রার বিবরণ লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিশাল আকারের মুঘল বাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য সেনাবাহিনীর যাত্রপথের দু-ধারে সম্রাটের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়ত রসদ জোগাড় করতে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া হতো বাহিনীর সঙ্গে চলমান বাজারে এসে জিনিসপত্র বিক্রিকরে যেতে। এইভাবে, যুদ্ধযাত্রাকে কেন্দ্র করেও খাদ্য দ্রব্যের বাণিজ্য চলত মধ্যযুগের ভারতে।

টুকরো কথা

পথের হদিশ

উত্তর ভারতে গঙ্গা ও যমুনা নদী ছিল প্রধান জলপথ। আগ্রা, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, রাজমহল, হুগলি, ঢাকা প্রভৃতি শহর নদীগুলোর মাধ্যমে যুক্ত ছিল। উত্তর- পশ্চিমে লাহোর থেকে শুরু করে দক্ষিণে সিন্ধু নদের মোহনা পর্যন্ত এলাকা জলপথে যুক্ত ছিল। উত্তর ভারত থেকে গুজরাট যাওয়ার দুটি সড়ক পথ ছিল। একটি রাজপুতানার আজমির হয়ে, অপরটি মধ্য ভারতের

বুরহানপুর হয়ে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম তটের মধ্যে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ ছিল গুজরাটের সুরাট থেকে ঔরঙ্গাবাদ, গোলকোণ্ডা হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে মসুলিপটনম পর্যন্ত।

মধ্য যুগে মানুষ কেমন ভাবে নানা তাগিদে দূরের পথে পাড়ি দিত তার এক চমৎকার উদাহরণ চিশতি সুফি সাধক গেসু দরাজের জীবনী। শৈশবে আরও অনেকের মত তিনিও দিল্লি থেকে চলে যান মহম্মদ বিন তুঘলকের নতুন রাজধানী দৌলতাবাদে। সাত বছর পরে ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন ও সেখানে তেষট্টি বছর ছিলেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ দিল্লি আক্রমণ করলে তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

৬.৩ ভারতে বিদেশী বণিকদের আগমন

ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে আসার জন্য প্রথম দিকে পোর্তুগিজরাই উৎসাহ দেখিয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার বাণিজ্যকে দখল করা। ইউরোপে ভারতের মশলা, বিশেষ করে গোলমরিচের চাহিদা ছিল খুব বেশি। পোর্তুগিজরা ভেবেছিল যে ভারত থেকে মশলা কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করতে পারলে অনেক লাভ হবে। এই ভেবে পোর্তুগালের রাজার দূত ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দক্ষিণে মালাবারের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। কালিকট বন্দরটি ছিল আরব সাগরের তীরে। এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বন্দরগুলোর খুব ভালো যোগাযোগ ছিল। ফলে নানা দেশের বণিকরাই এখানে আসত বাণিজ্যের টানে।

ভাস্কো দা গামা-র পরে পোর্তুগিজ নৌ-সেনাপতি ডিউক অফ আলবুকার্ক ভারতে আসেন। তিনি আরব সাগরের বাণিজ্যে আরবদের হঠিয়ে নিজেদের আধিপত্য জমাতে চান। তার হাত ধরেই গোয়ায় পোর্তুগিজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইউরোপের বণিকরা শুধুমাত্র বাণিজ্যই করত না। তারা সমুদ্রকেও নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করত। তাদের জাহাজগুলি ছিল উন্নতমানের এবং সেগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত। এর জোরে তারা আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। গভীর সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ওপর নানারকম বিধি-নিষেধ চালু করার চেষ্টা করেও পোর্তুগিজরা অবশ্য বেশিদূর সফল হয়নি। এশিয়ার বণিকরা নিজেদের মধ্যে যে বাণিজ্য করত তা চলতেই লাগল। পোর্তুগিজরাই বরং কালে-কালে সেই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে দিল।

টুকরো কথা

নতুন দেশের খোঁজে ইউরোপের মানুষরা

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা সামুদ্রিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা চাইছিল ইউরোপের বাইরে যে মহাদেশগুলো আছে সেখানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনসম্পদ আয় করতে। এই ভাবে তারা পৌঁছায় আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে। এই সব অভিযান হতো পালতোলা জাহাজে চেপে। উৎসাহী অভিযানকারীরা ইউরোপের নানা দেশের রাজা বা অভিজাতদের সমর্থনে অভিযান শুরু করত। প্রথম দিকে স্পেন এবং পোর্তুগাল দেশের অধিবাসীরা এই সব অভিযানে ছিল খুবই সক্রিয়। তারপর ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের বণিক ও শাসকরা এই ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

মানচিত্র ৬.২ : ভাস্কো দা গামা-র ভারত অভিযান

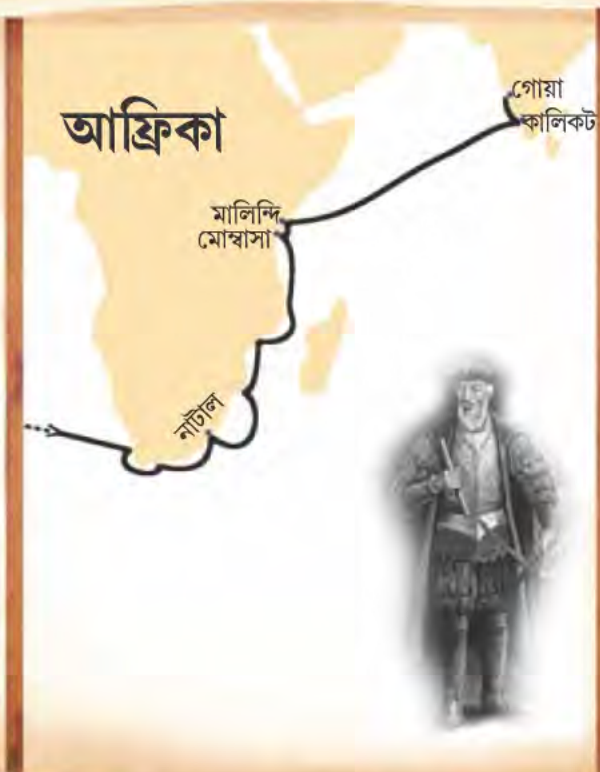

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

টুকরো কথা
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে গড়ে উঠেছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডামে তৈরি হয় হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে তৈরি হয় ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

টুকরো কথা
বাংলায় বাণিজ্য কুঠি

*বাংলায় **ব্যান্ডেলে** পোর্তুগিজরা তাঁদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। **চুঁচুড়ায়** ডাচরা, **চন্দননগরে** ফরাসিরা, **শ্রীরামপুরে** দিনেমাররা ও **কলকাতায়** ইংরেজরা তাদের কুঠি নির্মাণ করেছিল।*

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ইউরোপে অনেকগুলো বাণিজ্যিক কোম্পানির পত্তন ঘটে। এর মধ্যে ইংরেজ, ডাচ বা ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার প্রমুখ বণিকরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল মুঘল আমলে। ভারতে বিদেশী বণিকদের মধ্যে ওলন্দাজরা পশ্চিম ভারতে সুরাট ও দাক্ষিণাত্যে মসুলিপটনম বন্দর এলাকায় জমিয়ে বসেছিল। মসুলিপটনমের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছিল কারণ দক্ষিণ ভারতের ছিট কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। অন্যদিকে সুরাট ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের প্রধান বন্দর। কিছুকাল পরে ডাচরা বাংলাদেশেও চলে আসে।

ইংরেজ বণিকরা প্রথমে মসুলিপটনম ও পরে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের (শাসনকাল ১৬০৩-'২৫ খ্রিঃ) দূত টমাস রো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজসভায় এসেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় আগ্রা, পাটনা ও বুরহানপুরে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। মুঘল বাদশাহ

শাহ জাহান দাস ব্যবসা করার অপরাধে পোর্তুগিজদের হুগলি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (১৬৩২ খ্রিঃ)। এর ফলে ওলন্দাজ,ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা অবাধে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় দালালদের মাধ্যমে কাজ করত। তারা দালালদের দাদন (অগ্রিম অর্থ বা কাঁচামাল) দিয়ে দিত, যা দিয়ে ভারতীয় কারিগররা ইউরোপীয় বণিকদের চাহিদা মতো জিনিস বানিয়ে দিত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর যাতায়াতের ফলে বাংলাদেশের চাষিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধান ছেড়ে আফিম ও রেশম চাষ করতে শুরু করে। এইভাবে বাজারে ফসল বেচে লাভ করার জন্য যে চাষ করা হতো তাকে বলে বাণিজ্যিক চাষ।

রেখচিত্র ৬.১ : ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য

টুকরো কথা

ওলন্দাজ ও দিনেমার

নেদারল্যান্ডস দেশের লোকেদের বলা হয় ডাচ। এরা বাংলা ভাষায় ওলন্দাজ নামেও পরিচিত। ওলন্দাজ নামটি এসেছে পোর্তুগিজ শব্দ হলান্দেজ থেকে। নেদারল্যান্ডস দেশটি হল্যান্ড নামেও পরিচিত। দিনেমার বলতে ডেনমার্কের লোকেদের বোঝানো হয়।

ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি আস্তে আস্তে নানা ঘাঁটি বানাতে শুরু করে। কোম্পানির কুঠিতে ইউরোপীয় বণিকরা নিজেদের মতো করে বাড়িঘর করত। কুঠিগুলো তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দুর্গের মতো সুরক্ষিত করে রাখত। এখানে তাদের বাসগৃহ ও মালের গুদাম থাকত। নিজেদের জাহাজে করে তারা ইউরোপে মাল পাঠাত। ভারতীয় জাহাজের তুলনায় ইউরোপীয়দের জাহাজ আকারে বড়ো হতো এবং সেগুলি গভীর সমুদ্রে নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল।

৬.৩ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। কোন কোন বিদেশি বণিক কোম্পানি কোথায় কোথায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল, তার একটা তালিকা তৈরি করো।

এইভাবে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ভারতে গুজরাট, উত্তর ও দক্ষিণ করমণ্ডল এবং বাংলা হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় বণিকদের প্রধান অঞ্চল। এই চারটি অঞ্চলে যথাক্রমে সুরাট, মসুলিপটনম, পুলিকট এবং হুগলি ছিল ইউরোপীয়দের প্রধান বাণিজ্যঘাঁটি। এইসব অঞ্চলের কারিগররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত সেখানকার গ্রামগুলিতে। করমণ্ডলের গ্রামগুলোতে সুতো-কাটুনি, তাঁতি, কাপড় ধোলাই এবং রং করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল চাষিদের থেকে অনেক বেশি।

মুঘল শাসকরা বাণিজ্য করতে বণিকদের উৎসাহ দিত। মালের ওপর শুল্ক ছাড় দিয়ে, কুঠি বানানোর অনুমতি দিয়ে তারা বণিকদের সুবিধা করে দিত। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি বাণিজ্য করত। তবে এই প্রয়াস ছিল খুবই সীমিত। মুঘল সম্রাটরা, রাজপুত্ররা ও অভিজাতরা নিজেদের প্রয়োজনে ও শখ মেটাতে নিজেদের কারখানায় কারিগরদের দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন জিনিস, অস্ত্র, বিলাসদ্রব্য তৈরি করাতো। কিন্তু সেগুলো কখনই বাণিজ্যের স্বার্থে তৈরি হয়নি। তাই ইউরোপে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভিত্তি করে অর্থনীতি এগিয়ে চলল, ভারতে তখনও কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি।

মানচিত্র ৬.৩ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ভারতে কয়েকটি বিদেশি ঘাঁটি

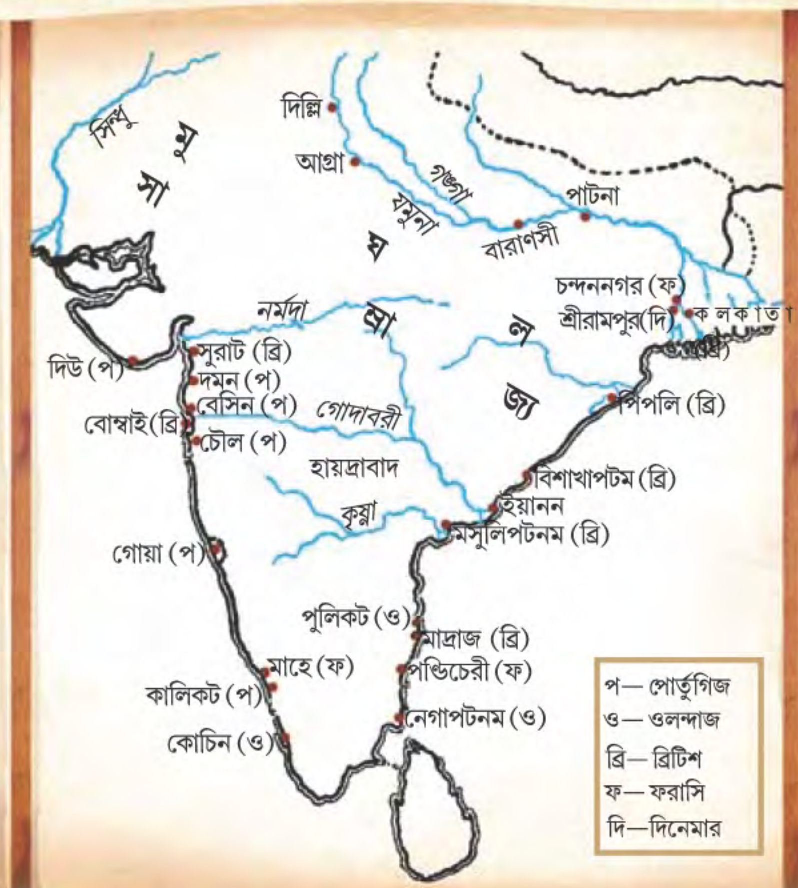

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও: **পূর্ণমান ১**

(ক) শাহজাহানাবাদ, তুঘলকাবাদ, কিলা রাই পিথোরা, দৌলতাবাদ।

(খ) তঙ্কা, মোহর, হুন্ডি, জিতল।

(গ) নীল, গোলমরিচ, সুতি বস্ত্র, রুপো।

(ঘ) করওয়ানি, কসবা, বনজারা, মুলতানি।

(ঙ) পাণ্ডুয়া, বুরহানপুর, চট্টগ্রাম, গৌড়।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো : **পূর্ণমান ১**

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
সিরি	ডেনমার্কের অধিবাসী
দিনেমার	শেখ নাসিরউদ্দিন
সরাফ	আলাউদ্দিন খলজি
হৌজ	মুদ্রা বিনিময়কারী
চিরাগ-ই দিল্লি	জল সংরক্ষণ

৩। সংক্ষেপে (৩০-৩৫ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৩**

(ক) কী কী ভাবে মধ্য যুগের ভারতে শহর গড়ে উঠত?

(খ) কেন সুলতানদের সময়কার পুরোনো দিল্লির আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়েছিল?

(গ) কেন, কোথায় শাহজাহানাবাদ শহরটি গড়ে উঠেছিল?

(ঘ) ইউরোপীয় কোম্পানির কুঠিগুলি কেমন ছিল?

(ঙ) মুঘল শাসকরা কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৫**

(ক) খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে দিল্লি কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে উঠেছিল?

(খ) শাহজাহানাবাদের নাগরিক চরিত্র কেমন ছিল?

(গ) দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার কেন ঘটেছিল?

(ঘ) মধ্য যুগে ভারতে দেশের ভেতরে বাণিজ্যের ধরনগুলি কেমন ছিল তা লেখো।

(ঙ) ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির আমদানি-রপ্তানির রেখচিত্র দেখে ওই যুগের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) তুমি যদি সুলতানি আমলে দিল্লির একজন বাসিন্দা হও তাহলে কী কী ভাবে তুমি দৈনন্দিন প্রয়োজনে জল পেতে পারো?

(খ) মনে করো তুমি একটি ইউরোপীয় কোম্পানির ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে তোমাকে বোম্বাই থেকে সুরাট হয়ে আগ্রার মুঘল দরবারে যেতে হচ্ছে। তুমি কোন পথে যেতে পারো? এঁকে দেখাও।

(গ) খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় বঙ্গোপসাগরে ভাগীরথীর মোহনা থেকে তুমি ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে যাচ্ছ। পথে তুমি কোথায় কোথায় ইউরোপীয় কুঠি দেখতে পাবে, তা মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

তুলো ধোনা, সুতো রং করা এবং কাপড় তৈরি

মাছ ধরা এবং পাখি ধরা

মুঘল শিল্পীদের চোখে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার কয়েকটি দিক

আগ্রার দুর্গ নির্মাণ (১)

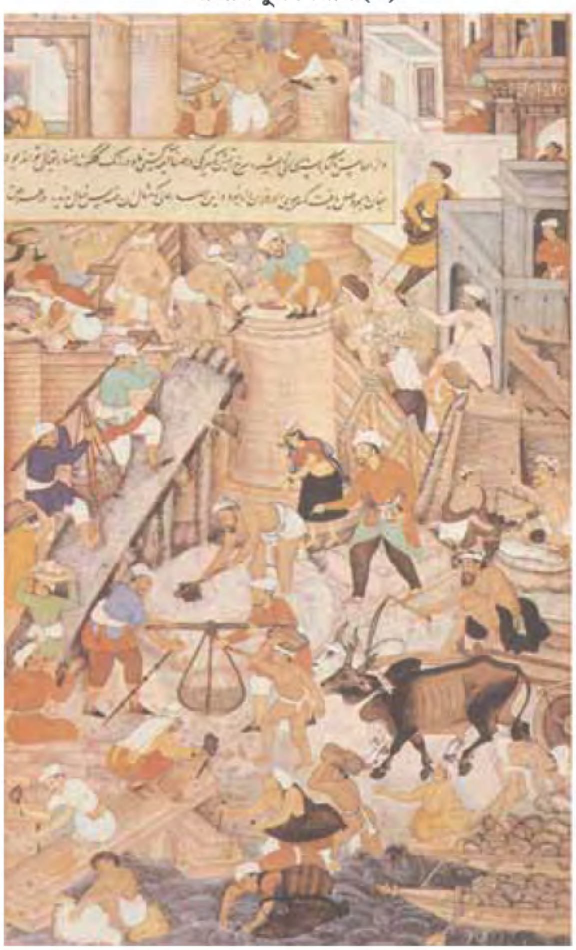

আগ্রার দুর্গ নির্মাণ (২)

সপ্তম অধ্যায়

জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি

সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.১ জীবনযাত্রা

সুলতান, বাদশাহ, রাজা-উজিররা দেশ শাসন করেন। তাঁদের কথা লেখা থাকে নানা বইতে। কিন্তু, দেশের অগণিত সাধারণ গরিব মানুষের কথা বিশেষ কিছু বলা থাকে না। অথচ সেই গরিব জনগণের চাষ-বাস, শিল্প থেকে যে টাকা আয় হয় তাতে রাজা-বাদশাহের শাসন চলে। তাহলে দেখা যেতে পারে কেমন ছিল সাধারণ মানুষের জীবন সুলতানি এবং মুঘল যুগে।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামেই বাস করতেন। স্থানীয় চাহিদা মেটানোই ছিল চাষের প্রধান কাজ। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তুলনায় বড়ো শিল্প দেখা যেত। কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধার জন্য নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি করা হতো। বাংলা এবং গুজরাটে এই সুবিধা থাকায় সেখানে শিল্পাঞ্চল ছিল। দেশের শাসকরা চাষির ফসলের একটা মোটা অংশে ভাগ বসাত। তার বদলে সাধারণ লোকের শান্তিতে বাস করার ব্যবস্থা করে দিত প্রশাসন।

গাঙ্গেয় সমভূমিতে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে আমের সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল। আঙুর, খেজুর, জাম, কলা, কাঁঠাল, নারকেল প্রভৃতি ফলেরও চাষ হতো। নানা রকম ফুল, চন্দনকাঠ, ঘৃতকুমারী এবং নানা ভেষজ উদ্ভিদ ভারতে হতো। লঙ্কা, আদা এবং অন্যান্য মশলাও চাষ হতো। আর ছিল নানান গৃহপালিত পশুপাখি।

কৃষি-পণ্যকে ভিত্তি করে গ্রামে কারিগরী শিল্প চলত। চিনি এবং নানান সুগন্ধি আতর তৈরির শিল্প ছিল বিখ্যাত। এই শিল্পগুলি বংশগত ছিল। তাই পুরোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও শিল্পদ্রব্যগুলির মান হতো অসাধারণ।

১১২ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলি ভালো করে দেখো। ছবিগুলিতে কারা কী কী কাজ করছে?

এই সময়ে চালু শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, ধাতুর কাজ, পাথরের কাজ, কাগজ শিল্প প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজমিস্ত্রি এবং পাথরের কাজে পটু কারিগরদের চাহিদা ছিল সর্বত্র। টালি ও ইঁটের ব্যবহার করে বাড়ি বানানোর পদ্ধতি চালু হয়েছিল বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলে।

রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সবসময়ে সমান ছিল না। দেশে দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ লাগলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ত। আবার জিনিসপত্রের খুব

কম দামের নজির ছিল ইব্রাহিম লোদির রাজত্বকাল। একটা বহলোলি মুদ্রা (সুলতান বহলোল লোদির আমলে চালু) দিয়ে লোকে দশ মণ খাদ্যশস্য, পাঁচ সের তেল এবং দশ গজ মোটা কাপড় কিনতে পারত।

আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে পণ্যদ্রব্যের দামের তুলনা করলে কি কোনো তফাত দেখা যাবে?

টুকরো কথা

প্রতি মণের দাম জিতলের হিসাবে

পণ্যদ্রব্য	আলাউদ্দিন খলজি	মহম্মদ বিন তুঘলক	ফিরোজ শাহ তুঘলক
গম	৭ ১/২	১২	৮
যব	৪	৮	৪
ধান	৫	১৪	—
ডাল	৫	—	৪
মসুর	৩	৪	৪
চিনি	১০০	৮০	—
ভেড়ার মাংস	১০	৬৪	—
ঘি	১৬	—	১০০

শোনা যায় মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে বাংলায় নাকি জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। ইবন বতুতা বাংলায় জিনিসপত্রের দামের একটা তালিকা দিয়েছেন—

একটি মুরগি	১ জিতল
পনেরোটি পায়রা	৮ জিতল
একটি ভেড়া	১৬ জিতল
তিরিশ হাত লম্বা খুব ভালো কাপড়	২ তঙ্কা
চাল (প্রতি মণ)	৮ জিতল
একটি ছাগল	৩ তঙ্কা
চিনি (প্রতি মণ)	৩২ জিতল

সমাজ ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। সমাজে এবং পরিবারে পুরুষদের তুলনায় নারীর স্থান ছিল নীচে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে ঘোমটা এবং পর্দার প্রচলন ছিল। কিন্তু গরিব কৃষক পরিবারে, নারী-পুরুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার এবং খামারে পরিশ্রম করতে হতো। সেই সব ক্ষেত্রে মহিলাদের পর্দা বা ঘোমটার বিশেষ প্রচলন ছিল না।

সাধারণ গরিব জনগণের বসতির জন্য সামান্য কিছু উপকরণ লাগত। একটা পাতকুয়া, ডোবা বা পুকুর থাকলেই বসতি তৈরি করে নিতে পারত গ্রামের মানুষ। ঘর তোলার জন্য কয়েকটি গাছের গুঁড়ি, চাল ছাইবার জন্য কিছু খড়। এতেই তারা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নিত।

সরকারি খাজনা ও নানা পাওনা মিটিয়ে ফসলের কিছু অংশ কৃষকের হাতে থাকত। সেটাই ছিল রোজকার ব্যবহারের সম্বল। বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষক পরিবার গুলি দিন-রাত পরিশ্রম করত। কৃষকের দৈনন্দিন জীবন বিষয়ে অল্প তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ের একজন ওলন্দাজ বণিক লিখেছেন যে, গরিবরা মাংসের স্বাদ প্রায় জানতই না। তাদের রোজের খাবার ছিল একঘেয়ে খিচুড়ি। তাই দিয়েই সারাদিনে একবার মাত্র বিকেল বেলায় তারা খালি পেট ভরাত। পরবার পোশাকও যথেষ্ট ছিল না। একজোড়া খাটিয়া ও রান্নার দু-একখানা বাসনই ছিল তাদের ঘর-গৃহস্থালি। বিছানার চাদর ছিল একটি বা বড়ো জোর দুটি। তাই তারা পেতে শুতো, দরকারে গায়ে দিত। গরমের দিনে তা যথেষ্ট হলেও দারুণ শীতে তাদের ভীষণই কষ্ট হতো। পালা-পার্বণে আনন্দ-উৎসব ছিল একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে ভেবে দেখো, মুঘল সম্রাটরা ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তাদের অভিজাতরা প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও তাজমহলের মতো স্থাপত্য নির্মাণের জন্য তারা বিপুল অর্থ খরচ করতেন। দামি পোশাক, অলংকার, নানা রকম বিলাস দ্রব্যের জন্য টাকা খরচ করতে তারা দুবার ভাবতেন না।

সে যুগের খেলাধুলোর মধ্যে কুস্তি ছিল একটি জনপ্রিয় খেলা। অভিজাত, সাধারণ জনগণ এমনকী সাধু-সন্তরাও কুস্তির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তির-ধনুক, বর্শা ছোঁড়া ও সাঁতার জনপ্রিয় ছিল। বাংলায় বাঁটুল ছোঁড়া নামের একরকম খেলার কথা জানা যায়। লোকগান, নাচ, বাজিকর বা জাদুকরের খেলা, সং প্রভৃতি ছিল সাধারণ মানুষের আনন্দের উপকরণ।

দিল্লিতে এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে শাসকের বদল ঘটেছে নানা সময়ে। কিন্তু, সুলতানি ও মুঘল যুগে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় একই রয়ে গেছে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর অভাবের সংসার — সেযুগে ভারতের গরিব কৃষক, কারিগর, শ্রমিকের জীবন বলতে এটুকুই।

? এর থেকে তুমি সেযুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী ধারণা করতে পারো?

টুকরো কথা

সেকালের সময় মাপা

দিন-রাতের সময় বোঝার জন্য সমস্ত দিন-রাত কে আটটি 'প্রহর' (ফারসিতে 'পাস')-এ ভাগ করা হতো। একেকটি প্রহর আজকের হিসাবে প্রায় তিনঘন্টা। আটটি প্রহর আবার ষাটটি 'ঘড়ি'তে (ঘটিকা) বিভক্ত ছিল। এক ঘড়ি সমান আজকের চব্বিশ মিনিট। প্রতিটি ঘড়ি আবার ষাটটি 'পল'-এ ভাগ করা ছিল। এইভাবে দিনরাত্রি মিলিয়ে হতো তিনহাজার ছশো পল। প্রহর ও ঘড়ির যথাযথ সময় বুঝে নেওয়া যেত পাঁজির সাহায্যে। জলঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণ করা হতো। প্রধান শহরগুলিতে ঘন্টার আওয়াজ করে সময় কতো হলো তা জানান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে এই কাজের জন্য আলাদা একটা দফতরই ছিল।

জীবন-জীবিকার নানা রকম : সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.২ নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা: ভক্তি ও সুফিবাদ

মধ্যযুগের ভারতে জীবনযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ধর্ম। ভারতে সুলতানি আমলে ধর্ম নিয়ে নতুন কিছু ভাবনার কথা শোনা যায়। পুরোনো আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তখনও কায়েম ছিল। কিন্তু মানুষের মনের উপরে তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। এই অবস্থায় ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের কথা শোনা যেতে থাকে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের উপর এই ধর্মপ্রচারকরা জোর দেন। এইরকমের চিন্তাধারা ছিল প্রথাগত ধর্মমতের একেবারে বাইরে।

ভক্তিবাদ

ভক্তিবাদের মূলে ছিল ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালবাসা বা ভক্তি। এই ভক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি হলো ভগবানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। অন্যটি হলো ঈশ্বরলাভের জন্য জ্ঞান বা যোগ ছেড়ে ভক্তের ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রথমে দক্ষিণ ভারত এবং পরে উত্তর ভারতের ভক্তিবাদের মূল কথা হয়ে ওঠে।

ভক্তিবাদের উত্থানের কারণ কী ছিল? খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের পতনের পরে কয়েকজন রাজপুত রাজা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এদের সমর্থন করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। তখন রাজপুত এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে নতুন কোনো ধর্মভাবনা তখনকার উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি। তবে সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু মানুষ ভক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাথপন্থী, যোগী ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠীরা এর প্রমাণ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিতি পেয়েছিল দক্ষিণ ভারতের অলভার এবং নায়নার (বহুবচনে নায়নমার) সাধকরা। উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এই সাধকদের হাত ধরেই ভক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল।

ঐ সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম মানুষের জীবনে অচল হয়ে পড়েছিল। কারণ এই ধর্মমতগুলি অযথা রীতিনীতির উপর জোর দিত বা চূড়ান্ত ভাবে অ-সাংসারিক জীবন যাপন করতে বলত। এতে না ছিল মানুষের আবেগের জায়গা, না ভালো থাকার চাবিকাঠি।

এরকম অবস্থায় সরল, সোজা তামিল ভাষায় নিজের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জানায় অলভার এবং নায়নার সাধকরা। এতে আকৃষ্ট হয় সাধারণ

মনে রেখো

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বিভিন্নভাবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের উপর নানা নিষেধ আরোপ করত। অব্রাহ্মণদের না ছিল পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠের স্বাধীনতা, না সমানভাবে মন্দিরে যাওয়ার অধিকার। অন্য জাতি বা বর্ণের মধ্যে একসঙ্গে খাওয়া বা বিয়ে করাও নিষিদ্ধ ছিল।

মানুষ। ক্রমে অবশ্য দক্ষিণের এই ভক্তিবাদও বাইরের রীতিনীতি এবং দেবতাপুজোকে বেশি প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলে তারাও মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। দক্ষিণের ভক্তিবাদ কখনোই সমাজে ব্রাহ্মণদের গুরুত্বকে খাটো করার ক্ষমতা রাখত না।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তুর্কিরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে। তাদের কাছে হেরে যাওয়ায় রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা কমে আসে। তার সঙ্গেই কমে যায় তখনকার সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের দাপট। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন। ভারতবর্ষের নানাদিকে শোনা যেতে থাকে তাঁদের কথা, লেখা, কবিতা এবং গান।

ছবি ৭.১ : গুরু নানক

টুকরো কথা

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

গুরু নানক ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের মধ্যে অন্যতম। কোনোরকম ভেদাভেদ না মেনে সমস্ত মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই চালু হয় লঙ্গারখানা। সেখানে এক সঙ্গে সব ধরনের মানুষরাই খেতে বসতো। এটি শিখ গুরুদ্বারে বা ধর্মীয় স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। নানক নিজে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তবে তাঁর দর্শন এবং বাণীর উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে শিখ ধর্ম। এই ধর্মে দশজন গুরুর কথা বলা রয়েছে যাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন গুরু নানক। এঁদের বাণী লিপিবন্ধ রয়েছে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে। তার নাম গুরুগ্রন্থসাহিব। এটি গুরমুখি লিপিতে লেখা।

তবে এই সাধকদের ভক্তিচিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু এঁদের সবার ভক্তি দর্শনের মূল কথা ছিল দুটি। একটি হলো কোনো ভেদাভেদ না করে সব মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যটি হলো সমস্ত আচার ছেড়ে ভগবানকে নিজের মতো করে পাওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন সাধিকা মীরাবাঈ (১৪৯৮-১৫৪৪খ্রিঃ)। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে রাজস্থানের একটি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম ও মেওয়াড়ের শাসককুলে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি তাঁর সাধিকা জীবনের অনেকটা সময়েই কাটিয়েছিলেন গুজরাটের দ্বারকায়। তিনি কখনোই সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকেননি। মীরাবাঈ তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিতে।

মীরাবাঈ রচিত পাঁচশোরও বেশী ভক্তিগীতি ভারতীয় সংগীত এবং সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তেমনই একটি ভক্তিগীতি হলো—

'মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরা না কোঈ,
যাকে শির মোর মুকুট
মেরে পতি সোঈ...'

—আমার প্রভু গিরিধর গোপাল ছাড়া আর কেউ নয়। যাঁর শিরে (মাথায়) ময়ূরের পাখার মুকুট তিনিই যে আমার পতি।

ছবি ৭.২ : মীরাবাঈ

মীরাবাঈয়ের উদাহরণ থেকে তোমরা কিন্তু ভেবে বসো না যে, তখনকার ভক্তিবাদে কেবল তথাকথিত উঁচুজাতের মানুষরাই বিশ্বাস করত। সাধকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তথাকথিত নীচুজাতির। যেমন, সন্ত রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে ছিল জাতিতে চামার রবিদাস, নাপিত সাই বা কসাই সাধনা।

টুকরো কথা

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)

বারাণসীতে এক মুসলিম জোলাহা (তাঁতি) পরিবারে পালিত হন কবীর। তিনি ছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের একজন বিখ্যাত ভক্তিসাধক। কেউ কেউ মনে করেন যে কবীর ছিলেন রামানন্দের একজন শিষ্য। ইসলামের একেশ্বরবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব, নাথ-যোগী এবং তান্ত্রিক বিশ্বাসও এসে মিশেছিল কবীরের ভক্তিচিন্তায়। তাঁর কাছে সব ধর্মই ছিল এক, সব ভগবানই সমান। তাই কবীরের মতে রাম, হরি, গোবিন্দ, আল্লাহ, সাঁই, সাহিব ইত্যাদি ছিল এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম। কবীর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার ভক্তি দিয়ে নিজের মনেই ঈশ্বর খুঁজে পাবে। তার জন্য মন্দিরে-মসজিদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই মূর্তি পুজো বা গঙ্গাস্নান বা নামাজ পড়া তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন। তখনকার সামাজিক জীবনে কবীরের ভাবনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর গান এবং দোহা শুনলে বোঝা যায় তিনি ধর্মের লোক-দেখানো আচারের বিরোধী ছিলেন।

হিন্দি ভাষায় দুই পংক্তির কবিতাকে বলে দোহা। কবীরের একটি দোহা হলো :

'জৈসে তিল মেঁ তেল হ্যায়
জিয়ু চকমক্ মেঁ আগ
তেরা সাঁই তুঝ মেঁ হ্যায়,
তু জাগ সকে তো জাগ...'

ছবি ৭.৩ : কবীর

গুরুনানক ও কবীরের কথা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারতেন। এর পিছনে কী কী কারণ ছিল বলে তোমার মনে হয়?

—তিলের মধ্যে যেমন তেল আছে, চকমকি পাথরের মধ্যে যেমন আছে আগুন, তেমনি তোর ভগবান (সাঁই) তোর মধ্যে আছে। যদি ক্ষমতা থাকে তো জেগে ওঠ।

পাঁচশোরও বেশি কবীরের দোহা গুরুগ্রন্থসাহিবের অংশ। শিখ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের কাছে কবীরের আসন দশজন শিখগুরুর পাশেই। কবীরের দোহার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা শুনত সাধারণ মানুষ। কারখানার মজুর, চাষি, গ্রামের মোড়ল— সবার মুখের ভাষাই ছিল দোহার ভাষা।

লোকমুখে শোনা যায় যে, কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু এবং মুসলিম ভক্তরা কবীরকে হিন্দু মতে দাহ করা হবে না কি ইসলামীয় মতে গোর দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে। সে সময় কবীরের দেহ অদৃশ্য হয়। সেই জায়গায় পাওয়া যায় সাদা কাপড়ের উপর এক মুঠো লাল গোলাপ। এই ফুল দুই সম্প্রদায়ের ভক্তরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। গল্পের সত্য-মিথ্যা বিচার না করেও আমরা বুঝি কিভাবে তখনকার মানুষের মনে কবীর শান্তি এবং সাম্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

ছবি ৭.৪ :
গুরু নানক এবং কবীরের মধ্যে কাল্পনিক আলাপের দৃশ্য। এর থেকে বোঝা যায় যে শিখরা সন্ত কবীরকে শ্রদ্ধা করত।

সুফিবাদ

নিজের মতো করে ভগবানকে ডাকার ইচ্ছা কিন্তু হিন্দুধর্মের মানুষদের বা বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় আইন কানুনের বাইরে বহু মুসলমান ঈশ্বরকে নিজের মতো করে আরাধনা করার পথ খুঁজছিলেন। সুফিসন্তরা তাদেরকে এই পথ দেখায়।

সুফিদের আর্বিভাব মধ্য এশিয়ায়। আন্দাজ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে তাঁরা ভারতে আসতে থাকে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশে সুফিবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে, সুফি কথাটি আসে *সুফ* থেকে যার অর্থ আরবিতে পশমের তৈরি এক টুকরো কাপড়। বিশ্বাস করা হয় যে, এরকম কম্বল জাতীয় জিনিস গায়ে দিতেন সুফি সাধকরা, খ্রিস্টান সন্তরা এবং সন্ন্যাসীরা।

ভারতের মাটিতে সুফিবাদ যখন দানা বাঁধছিল সে সময়ে ভক্তিবাদ ছাড়াও নাথপন্থী ও যোগীরা তাদের ধর্ম প্রচার করেছিল। এই সবকটিই তখনকার প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে ছিল। তাই আন্দাজ করা যায় যে সুফি, ভক্তি এবং নাথপন্থী ধর্মীয় ধারণা একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন মনে করা হয়, সুফিরা যে হঠযোগ অভ্যাস করত, তা তারা জেনেছিল নাথপন্থীদের কাছ থেকে। এ দেশে মূলত দুটি গোষ্ঠীর সুফিরা ছিল প্রভাবশালী। দিল্লি ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে চিশতি এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে সুহরাবর্দিরা। ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মইনউদ্দিন চিশতি। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া বা বখতিয়ার কাকি ছিলেন এই গোষ্ঠী বা সিলসিলার অন্যতম সাধক। চিশতি সুফিদের জীবন ছিল খোলামেলা। তাঁরা ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করতেন না।

টুকরো কথা

পির ও মুরিদ

অনান্য বেশ কয়েকটি সহজিয়া ধারার মতো সুফিও ছিল একটি সাধন ধারা। সুফি সিলসিলাগুলির প্রধান ব্যক্তি হতেন কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ সাধক। তিনি তার শিষ্যদের সঙ্গে থাকতেন 'খানকা'য় বা আশ্রমে। সুফি ধারায় পির বা গুরু এবং মুরিদ অর্থাৎ শিষ্যের সম্পর্ক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিররা তাঁদের ধর্মভাবনা ও দর্শন দিয়ে যেতেন বেছে নেওয়া খলিফা বা উত্তরাধিকারীদের। সেটাই ছিল নিয়ম।

ছবি ৭.৫ : সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতির দরগা, ফতেহপুর সিকরি, উত্তরপ্রদেশ।

ছবি ৭.৬ :
দরবেশ সাধকরা সাধনার জন্য একসঙ্গে জমায়েত হয়েছেন।

টুকরো কথা

সুফিদের জনপ্রিয়তা

সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি দিল্লিতে চিশতি মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এতে রেগে যায় গোঁড়া উলেমার দল এবং সুহরাবর্দিরা। কাকির বিরুদ্ধে আভিযোগ আনা হয় যে তিনি অ-ইসলামীয় আচার-আচরণ করেন। যেমন, তিনি 'সমা' বা সুফি 'কীর্তন' গান করেন। এর প্রতিবাদে বখতিয়ার কাকি যখন দিল্লি ছেড়ে শহরের বাইরে বেরোন, তখন নাকি হাজার হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে বহুদূর চলে আসেন। এই দেখে বখতিয়ার কাকি দিল্লি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

চিশতি সুফিরা রাজনীতি এবং রাজদরবার থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাজ্য পরিচালনার কাজে জড়িয়ে পড়লে কোনোভাবেই ঈশ্বরসাধনা সম্ভব নয়। অন্যদিকে সুহরাবর্দি সুফিরা অনেকেই দারিদ্র্যের বদলে আরামের জীবন বেছে নিয়েছিল। সুলতানের কাছ থেকে উপহার বা সাহায্য নিতে বা রাজ্যে ধর্মীয় উচ্চপদ গ্রহণ করতে সুহরাবর্দিদের কোনো সংকোচ হতো না। সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বদরউদ্দিন জাকারিয়া এক সময় সুলতান ইলতুৎমিশের পক্ষ নেন।

তবে চিশতি হোক বা সুহরাবর্দি, মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে এই সব সুফি সাধকদের অবদান ছিল প্রচুর। নিজেদের খোলামেলা জীবন এবং শান্তির বাণীর মধ্য দিয়ে তারা সর্বদা চেষ্টা করতেন সব মানুষকে এক সঙ্গে রাখতে। সুলতানি শাসনে বাস করা অ-মুসলমান মানুষরা সুফিদের এরকম মানবদরদী কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন। সহজিয়া ধর্ম (এ সম্পর্কে তোমরা আগে পড়েছো), ভক্তি, সুফি এবং আরো কিছু ধর্মমত তখনকার মানুষের কাছে একটা সরল বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। তারা বোঝাতে পেরেছিল যে, ঈশ্বরলাভের উপায় একমাত্র মনের ভক্তি দিয়ে আরাধনা করা। সংস্কৃতির উপরেও এই ভক্তিসাধক এবং সুফিসন্তরা নিজেদের ছাপ রেখেছিল। এর প্রমাণ ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। দোহা, কবিতা, কীর্তন এবং নানান নৃত্যশৈলীতে (যেমন, মণিপুরী নৃত্য) সেই ছাপ আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

টুকরো কথা

বা-শরা ও বে-শরা

সুফিরা ছিল প্রধানত দুই প্রকারের। 'বা-শরা' অর্থাৎ যারা ইসলামীয় আইন (শরা) মেনে চলত। এবং 'বে-শরা'— অর্থাৎ সেই সুফিরা যারা এই আইন মানতো না। ভারতে দুই মতাদর্শেরই সুফিরা ছিল। যাযাবর সুফি সম্প্রদায় কালানদার ছিল বে-শরা। চিশতি এবং সুহরাবর্দিরা ছিল বা-শরা।

৭.৩ শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রচার এবং প্রসার জোরদার হয় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর সঙ্গীদের চেষ্টায়। বাংলায়, বিশেষত রাঢ় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম আগে থেকেই ছিল। শ্রীচৈতন্য সেই বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য আর ভক্তিবাদের ভাবনাকে একাকার করে দেন। জাত-ধর্ম-বর্ণ এসব ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ভক্তির প্রচার একটা আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নবদ্বীপ ছিল এই ধর্ম-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কেমন ছিল সেই সময়ের নবদ্বীপ? নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে অব্রাহ্মণরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন। গ্রামের ছবিটি একই রকম ছিল।

ভেবে বলো

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন পাড়ায় বাস করত। তাদের জীবিকা ছিল নানারকম। শাঁখারি, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, বাদ্যকর, সাপেকাটার চিকিৎসক, বণিকপ্রভৃতি। তখনকার নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা আর শ্রীচৈতন্যের ভেদাভেদহীন ভক্তি প্রচার— এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়?

চৈতন্যের জন্মের অনেক আগে থেকেই বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ফলে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। হোসেনশাহি রাজত্বে শাসনকাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে কায়স্থদের প্রতিপত্তি বেড়েছিল। তার পাশাপাশি শাসক-আমলাদের অত্যাচারও ছিল। এইসব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উত্তর প্রচলিত হিন্দুধর্মে খুঁজে পায়নি সাধারণ গরিব মানুষ। ফলে, অনেকেই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে তুলনায় উদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এর পাশাপাশি, আগে থেকেই নানান ধর্ম ও বিশ্বাস সমাজে চালু ছিল। আকর্ষণ ছিল তান্ত্রিক সাধনার প্রতিও। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম—এই তিন লৌকিক দেবদেবীর পূজোর চল ছিল।

তবে নবদ্বীপের পরিবেশে ভক্তিবাদের প্রচার সহজ ছিল না। ব্রাহ্মণ 'ভট্টাচার্য'-রা বৈষ্ণবদের প্রবল বিরোধিতা করত। ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণবদের উপহাস করত।

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা মাত্র একটি সামাজিক নীতি মেনে চলায় জোর দিয়েছিলেন। সেই নীতিকেই *ভক্তি* বলা হয়েছে। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তার জন্য কোনো উদ্যোগ-আয়োজন লাগে না। সাধারণ জীবনযাপন এবং সহজসরল আচরণের উপরেই গুরুত্ব দিতেন শ্রীচৈতন্য। এতে কোনো আড়ম্বরের জায়গা ছিল না। চৈতন্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বৈষ্ণব ভক্তির জনপ্রিয়তা বেড়েছিল।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের ছবি

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বইয়ের প্রমাণ ধরলে চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চৈতন্যের ছবি নানা জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু ঠিক কেমন দেখতে ছিল চৈতন্যকে শুধু লিখিত প্রমাণ আছে তার। তাও সেই লেখা অনেক পরের। ফলে, চৈতন্যের যে ছবি আজ দেখা যায়, চৈতন্য আসলে তেমন দেখতে ছিলেন কি না, তা জানা যায় না। গৌতম বুদ্ধ বা যিশু খ্রিস্টের ছবির ক্ষেত্রেও একই রকম কথা বলা যায়।

ভেবে বলো

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃয়দাস কবিরাজ বলেছেন—

"নীচ জাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়ো অভক্ত হীন ছাড়।
কৃয়ভজনে নাহি জাতকুলাদি বিচার।।"

এর থেকে জাতপাতের প্রতি বৈয়ব-ভক্তি আন্দোলনের কীরকম দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পাওয়া যায়?

চৈতন্যের বৈয়ব ভক্তি প্রচার এবং প্রসারের একটা পরিকল্পিত কাঠামো দেখা যায়। যেমন—

- চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে যে বৈয়বগোষ্ঠী সংগঠিত হয় তাতে জাতবিচার ছিল না।
- চৈতন্য ঘরে ঘরে নামগান প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে বিশাল শোভাযাত্রা করে নগরকীর্তনের ব্যবস্থা করেন।
- চৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও, বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তথাকথিত নীচু জাতির মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন।
- কোনো প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা চৈতন্য করেননি। ভক্তি প্রচারকেই একমাত্র ধর্ম হিসাবে তুলে ধরেননি।
- নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচারের বিরোধিতা করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী নিত্যানন্দ। পাশাপাশি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রতিবাদ করেন তিনি। আবার কীর্তন-বিরোধী নবদ্বীপের কাজিকেও তর্কে হারিয়ে দেন। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা।
- চৈতন্য বৈয়বীয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নেন। নিজে তাতে অভিনয়ও করেন।
- ভক্তি সাধকরা সবাই জনগণের মুখের ভাষাতে প্রচার করতেন। চৈতন্যও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাংলা ভাষাতেই তিনি ভক্তি প্রচার করেন।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের আহার

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরে প্রায় উপোস করে দিন কাটাতেন। ভক্তরাই মাঝে মধ্যে নানা রকম রান্না করে তাঁকে খাওয়াতে চাইতেন। এমনই এক খাওয়ার বিবরণ বেশ মজার। শাক, মুগের ডাল, বেশি করে ঘি-মাখা ভাত, পটোল ও অন্যান্য সবজির তরকারি, কচি নিমপাতা ভাজা, বেগুন, মোচার ঘন্ট, নারকেল, ঘন করে জাল দেওয়া দুধ, পায়েস, চাঁপাকলা, দই-দুধ দিয়ে চিঁড়ে আরও নানা কিছু। মজার ব্যাপার তরকারি রান্নায় বড়ির ব্যবহার হতো। আর আলুর ব্যবহার হতো না।

তবে চৈতন্য নিজে এত কিছু খেতেন না, ভক্ত এবং অনুচরদের খাওয়াতেন। কীর্তনিয়াদেরও খাওয়াতেন। আবার ক্ষুধার্ত মানুষদের ডেকে এনেও খাওয়াতেন। কখনওবা তিনি ভক্তদের সঙ্গে বনভোজনে যেতেন এমন কথাও শোনা যায়।

এই বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল কী ছিল?

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব কমতে থাকে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা জাতিভেদ না মানলেও সমাজে ভেদাভেদ থেকেই গিয়েছিল।

সবরকম ভেদাভেদ পুরো দূর করতে না পারলেও, সেগুলিকে তুচ্ছ করা যায়— একথা চৈতন্য জোর দিয়েই প্রচার করেন। সেকালের তুলনায় ভাবলে এইটিই এক বড়ো সাফল্য ছিল। তবে চৈতন্য এবং তাঁর ভক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতিতে (**৭.৭.২ একক দেখো**)।

টুকরো কথা

কীর্তন

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের আগেও কীর্তন গান ছিল। চৈতন্য সেই কীর্তনগানকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। চৈতন্য দু-রকমের কীর্তন সংগঠিত করেন। নামকীর্তন ও নগরকীর্তন। নামকীর্তন ঘরে বসেই গাওয়া যেত। নগরকীর্তন নগরে শোভাযাত্রা করে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হতো। কীর্তনে জাতবিচার ছিল না। নেচে নেচে, দু-হাত তুলে গান গেয়ে চলাই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য ছিল। নামকীর্তন গাওয়া সবার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কবি পরমানন্দ লিখেছিলেন—

" নাচিতে জানিনা তবু নাচিয়া গৌরাঙ্গা বলি
গাইতে জানিনা তবু গাই।"

কীর্তন ছাড়া কথকথার মাধ্যমেও ভক্তির ভাব প্রচার করা হতো।

বৈষ্ণবদের রচনায় সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের ছবিই ধরা পড়ে। বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবগান-কবিতা লেখেন। ঘাঁটু, ঘাঁটু-তেলেনা, পটুয়া, রাসলীলা, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদির গানে আজও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এভাবেই ভক্তির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন শ্রীচৈতন্য। বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় এর মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের বদলে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের উপরে জোর পড়েছিল।

বলা হতো : "জ্ঞানে কূলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।" অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা বা উঁচুবংশে জন্ম দিয়ে কিছু হয় না। ভক্তির মাধ্যমেই চৈতন্য লাভ হয়।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের জীবনী

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য লেখার ধারা বিকশিত হয়েছিল। চৈতন্যের জীবনীগুলির থেকে একদিকে সমকালীন সমাজ এবং অন্যদিকে ব্যক্তি চৈতন্যের বিষয়ে আমরা নানা কথা জানতে পারি।

ভেবে বলো তো, কেন শ্রীচৈতন্যকে দিয়েই বাংলায় জীবনী সাহিত্যের ধারা বিকশিত হয়েছিল?

টুকরো কথা

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভক্তি আন্দোলন

ভক্তি আন্দোলনের একটি ধারা বিকশিত হয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মানুষ। এক কায়স্থ ভুঁইয়া পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ভাগবত পুরাণের এক অংশ তিনি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং কৃষ্ণের উপাসক। তাঁর প্রচারিত ভক্তির মূল কথা ছিল 'নাম ধর্ম'। তিনি তাঁর অনুগামীদের কৃষ্ণের নাম গান ও সংকীর্তন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনির উপরে জোর না দিয়ে কৃষ্ণের বাল্যলীলাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শঙ্করদেব ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। অনেক জায়গায় তিনি 'সত্র' (বৈষ্ণব ভক্তদের জমায়েত হওয়ার স্থান) গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে থাকত 'নাম ঘর' এবং 'কীর্তন ঘর'। তাঁর প্রচারিত ভক্তি ব্রহ্মপুত্র নদের দু-পাড়ে বসবাসকারী কৃষক, ছোটো ব্যবসায়ীদের মতো সমাজের নীচু তলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূল সমস্যার কথা ধরা পড়ত এর মধ্যে। পরের শতকে ভক্তি আন্দোলনের ভিত অসমে আরও শক্ত হয়েছিল। ঐ সময়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছিল। অহোম রাজারা মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করে অসমকে রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে ধান চাষের বিস্তার অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই সময়ে শঙ্করদেবের ভক্তির আদর্শ অসমের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মাধবদেব এবং দামোদরদেব ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

ছবি ৭.৭ : শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণবদের নগর সংকীর্তন।

৭.৪ দীন-ই ইলাহি

খ্রিস্টীয় ১৫৭০-এর দশকে বাদশাহ আকবর ক্রমশ সবার সামনে নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইসলামীয় আচার পালন করা বন্ধ করে দেন। এর বদলে তিনি নিজের পছন্দ মতো কিছু প্রথা পালন করতে শুরু করেন। এক সময়ে দিনে চারবার তিনি সবার সামনে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যপ্রণাম করা এবং সূর্যের নাম জপ করা শুরু করেন। ফতেহপুর সিকরি তে তিনি প্রথমে ইসলাম ধর্ম নিয়ে উলেমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরে তিনি নানান ধর্মের গুরুদের ডেকে ধর্মীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে এইসব আলোচনার ভিত্তিতে তিনি দীন-ই ইলাহি নামে এক নতুন মতাদর্শ চালু করলেন।

এক সময়ে ভাবা হতো দীন-ই ইলাহি বুঝিবা বাদশাহ আকবরের প্রচলিত এক নতুন ধর্ম। কিন্তু, আকবর কখনো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। ইসলাম ধর্মের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মতটি মেনে নিতেন। নানা ধর্মের গুরুদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিভিন্ন ধর্ম থেকে নিজের পছন্দ মতো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বেছে নিতেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আকবর দীন-ই ইলাহি তৈরি করেন। তিনি এর প্রচলন করেছিলেন নিজের সভাসদদের মধ্যে। কিন্তু, এখন এই সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা পালটে গেছে। এখন মনে করা হয় যে, দীন-ই ইলাহি আসলে ছিল আকবরের প্রতি চূড়ান্ত অনুগত কয়েকজন অভিজাতদের মধ্যে প্রচারিত এক আদর্শ। আকবর নিজে তাঁদের বেছে নিতেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাঁরা বাদশাহের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকার শপথ নিত। এই হলো দীন-ই ইলাহি।

এইভাবে, আকবর নিজের চারপাশে গড়ে তুললেন বিশ্বস্ত অনুগামীদের একটি দল। একেকজন সদস্যের ছিল একেক ধর্ম। তাঁরা কেউ পারস্যদেশের লোক, কেউ হিন্দু রাজপুত, আবার কেউ বা ভারতীয় মুসলমান। দীন-ই ইলাহি কোনো আলাদা ধর্ম ছিল না।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গিরও দীন-ই ইলাহি চালু রাখেন। তাঁর এক সেনাপতি মির্জা নাথান, যিনি বাংলা ও আসামে বহুকাল যুদ্ধ করেন, 'ইলাহি'-তে নিজের দীক্ষিত হওয়ার ঘটনার কথা লিখে গিয়েছেন নিজের আত্মজীবনীতে।

টুকরো কথা
টমাস রো-এর বিবরণে দীন-ই ইলাহি

মুঘল রাজসভায় আসা প্রথম ইংরেজ দূত টমাস রো-কেও সম্ভবত জাহাঙ্গির দীন-ই ইলাহিতে সামিল করেন। ভিনদেশ থেকে আসা দূতটি কিছু না জেনেই দীন-ই ইলাহি-তে প্রবেশ করার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফেলেন। টমাস রো-এর লেখায় তাঁর সঙ্গে বাদশাহের এই মুহূর্তটির একটি মজার বিবরণ পাওয়া যায় :

টুকরো কথা
দীন-ই ইলাহির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

যিনি দীন-ই ইলাহি গ্রহণ করতেন, তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতে তার জীবন (জান), সম্পত্তি (মাল), ধর্ম (দীন) ও সম্মান (নামুস) বিসর্জন (কুরবান) দেওয়ার শপথ নিতেন। শিষ্য (মুরিদ) যেমন তার সুফি গুরুর (পির) পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তাঁকেও তেমনই বাদশাহের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হতো। এরপর অনুষ্ঠান শেষ হলে বাদশাহ তাকে দিতেন একটি নতুন পাগড়ি, সূর্যের একটি পদক ও পাগড়ির সামনে লাগাবার জন্য তাঁর (বাদশাহের) নিজের ছোটো একটি ছবি।

আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি ঢোকামাত্র তিনি... আসফ খানকে একটি সোনার হার দিলেন। হারটিতে সোনার জলে আঁকা বাদশাহের নিজের একটি ছবি ও একটি মুক্তো লাগানো ছিল। তিনি আসফ খানকে নির্দেশ দিলেন যে [তিনি যেন হারটি আমাকে দেন, তবে] আমি যেটুকু সম্মান তাঁকে দেখাতে চাই, তার বেশি যেন তিনি আমার থেকে দাবি না করেন। এদেশের প্রথা অনুযায়ী বাদশাহ কাউকে কিছু দিলে সেই লোকটিকে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হয়।... এরপর আসফ খান হারটি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি হাত বাড়িয়ে সেটি নিতে গেলাম; কিন্তু তিনি ইশারায় আমাকে আমার টুপি খুলতে বললেন। [টুপি খোলার পর] আমার গলায় হারটি পরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বাদশাহের সামনে নিয়ে গেলেন। আমার কী করণীয় বুঝতে পারলাম না, তবে সন্দেহ হলো যে, তিনি চান যে আমি ও দেশের প্রথা অনুযায়ী সিজদা করি [অর্থাৎ ঐভাবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাদশাহকে সম্মান দেখাই]। কিন্তু আমি তা না করে আমার আনা উপঢৌকন বাদশাহকে এগিয়ে দিলাম। আসফ খান আমাকে বাদশাহকে ধন্যবাদ জানাতে নির্দেশ দিলেন। আমি আমার নিজের দেশের প্রথা মেনে ধন্যবাদ জানালাম। তাই দেখে কয়েকজন সভাসদ আমাকে সিজদা করতে বললেন, কিন্তু বাদশাহ ফারসিতে তাঁদের জোর করতে নিষেধ করলেন। আমাকে তিনি নানা কথা বলে ফেরৎ পাঠালেন; আমি এরপর নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

টমাস রো-র বিবরণ পড়ে বাদশাহ জাহাঙ্গিরের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়?

এখানে মনে রেখো যে, তাঁর আগের বেশিরভাগ সুলতান বা বাদশাহের থেকে আকবরের রাজত্বের ধর্মীয় চরিত্র ছিল আলাদা। গোঁড়া ইসলামের ছায়া থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন ১৫৭০-এর দশক নাগাদ। মৌলবি বা উলেমার কথামতো তিনি রাজ্য চালাতে চাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বহু ধর্ম এবং জাতির মানুষের বসবাস। সেখানে নিজের শাসন সুদৃঢ় করতে গেলে কোনো একটি ধর্মের বুলি আউড়ালে চলবে না। নিজেকে এবং নিজের শাসনকে সবার কাছে মান্য করে তুলতে গেলে বিভিন্ন ধর্ম থেকে নানা আচার-প্রথা গ্রহণ করতে হবে। এই বোধ থেকেই আকবর সূর্যপ্রণাম, সূর্যের নাম জপ, প্রাসাদের *ঝরোখা* (জানালা) থেকে সভাসদ এবং প্রজাদের দর্শন দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রথা চালু করেন। দীন-ই ইলাহির প্রথাগুলি ইসলামের রক্ষণশীল ব্যাখ্যাকারদের চোখে ছিল 'ইসলামবিরোধী'। কিন্তু, এই প্রথাগুলির মাধ্যমে আকবর ইসলামের গন্ডির বাইরে বেরিয়ে রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছেও নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

৭.৫ সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে দিল্লি সুলতানি শাসন শুরু হয়। সুলতানরা দিল্লি আর অন্য নানা জায়গায় অনেক স্থাপত্য তৈরি করেন। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ, মিনার , মন্দির-মসজিদ এসবকে স্থাপত্য বলে। এগুলি বানানোর কারিগরিকে স্থাপত্য শিল্প বলা হয়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের অনেক আগেই ভারতে আরবি স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে। দিল্লি সুলতানির আগে তৈরি মসজিদের ভাঙা অংশের খোঁজ পাওয়া গেছে গুজরাটে। এর থেকে বোঝা যায় ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্প ভারতে সুলতানির আগেই এসেছিল। এই স্থাপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান এবং গম্বুজ।

তবে সুলতানি শাসন জারি হওয়ার পরেই ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প মিলেমিশে যেতে পেরেছিল। এই দুই শিল্পধারা মিশেই তৈরি হয় ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি। সুলতানরা যে দেশের শাসক, তারা যে ক্ষমতাবান সেটা বোঝানোর দরকার ছিল। আর তাই তারা বড়ো বড়ো স্থাপত্য বানান। সুলতানরাও সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মচর্চার জন্য মসজিদ, মিনার, পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসা, থাকার জন্য প্রাসাদ, দুর্গ এসব বানানো শুরু হলো। সুলতানরা বা তাঁর আত্মীয় বা অভিজাত কেউ মারা গেলে তাদের স্মৃতিতে সৌধ, মিনার বানানো হতো। মাঝে মধ্যে সুলতানরা নিজেদের জীবনকালেই নিজেদের সমাধি সৌধের মূল কাঠামোটি তৈরি করে রাখতেন। সব স্থাপত্যের গায়েই লেগেছিল শিল্পের ছোঁয়া। সুন্দর কারুকার্যে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল স্থাপত্যগুলি।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের পর কুতুবউদ্দিন আইবক কুয়াত-উল ইসলাম মসজিদ বানাতে শুরু করলেন। এদেশের লোক যাতে তাঁকে শাসক বলে মেনে নেয় তার জন্য এটি দরকার ছিল। আশপাশের সাতাশটি হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের ভাঙা অংশ এই মসজিদ বানানোর কাজে ব্যবহার হয়। তাই এই মসজিদে হিন্দু, জৈন এবং ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের মিলমিশ নজর টানে। এই মসজিদের মিনারটি হলো কুতুব মিনার। এই মিনার সুলতানি শাসনের প্রতীক হয়ে উঠল। কুতুবউদ্দিন মারা যাওয়ার পর মিনারটি বানানোর কাজ শেষ করেন সুলতান ইলতুৎমিশ। ইলতুৎমিশের নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি এই যুগের আরেকটি চমৎকার স্থাপত্য।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমলে তৈরি হয় আলাই দরওয়াজা। এটি ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্পের অসাধারণ নমুনা। লাল বেলে পাথরের তৈরি এই 'দরওয়াজা' যেন সুলতান হিসাবে আলাউদ্দিনের ক্ষমতার প্রতিফলন

ছিল। দরওয়াজার গায়ে আল্লাহ্-র কথা নয়, খোদাই করা হয়েছিল সুলতানের প্রশংসা। এমন কাজের নমুনা সে যুগে বিরল। এটিও ছিল ওই কুতুব-চত্বরেই। কুতুবমিনার, ইলতুৎমিশের সমাধি, আলাই দরওয়াজা—সব মিলিয়ে কুতুব-চত্বর হয়ে উঠল সুলতানি স্থাপত্যের নজির।

তুঘলক সুলতানরা নগর বা শহরের পরিকল্পনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের দৌলতাবাদের দুর্গ-শহরে তেমন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের ফিরোজাবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাধি সৌধ বানানোর প্রতিও তুঘলক সুলতানরা মনোযোগী ছিলেন। যেমন, দিল্লির তুঘলকাবাদে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি। খাড়া দেওয়ালের বদলে গম্বুজ-বসানো ঢালু দেওয়াল ছিল এর বৈশিষ্ট্য।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতিতে লোদি সুলতানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আটকোণা সমাধি সৌধগুলি। চওড়া বাগানঘেরা চত্বরে এই সমাধি সৌধগুলি তৈরি করা হয়েছিল। চত্বরগুলির প্রবেশ পথে তৈরি করা হয়েছিল বড়ো দরওয়াজা।

অতএব, মুঘলরা যখন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তার আগেই দিল্লি সহ ভারতের নানা অঞ্চলে ইন্দো-ইসলামীয় ধারায় স্থাপত্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ছবি ৭.৮ : কুতুব মিনার এবং আলাই দরওয়াজা, দিল্লি।

আলাই দরওয়াজার খিলান এবং গম্বুজ লক্ষ করো।

ছবি ৭.৯ :
সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি, কুতুব-চত্বর, দিল্লি

স্থাপত্যশিল্পের বিরাট বদল হয় মুঘল শাসনের সময়ে। মুঘল সম্রাটরা প্রায় সবাই স্থাপত্যশিল্পের সমঝদার ছিলেন। নানান স্থাপত্যরীতির সহজ মেলামেশার ছাপ মুঘল স্থাপত্যে দেখা যায়।

সম্রাট বাবরের ছিল বাগানের খুব শখ। চারভাগে ভাগ করা একরকম সাজানো বাগান মুঘল আমলে বানানো হতো। তাকে 'চাহার বাগ' বলে। হুমায়ুনের আমলে দীন পনাহ শহরটি বানানো শুরু হয়। আফগান শাসক শের শাহ সাসারাম এবং দিল্লিতে কয়েকটি সৌধ বানিয়ে ছিলেন। সাসারামে তাঁর নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি যেন তাজমহলের পূর্বসূরি।

ছবি ৭.১০ :
শের শাহর সমাধি সৌধ, সাসারাম, বিহার

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের প্রসার শুরু হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে। ভারতে মুঘল শাসনের প্রসার এবং স্থাপত্য বানানোর কাজ আকবর একসঙ্গে করেছিলেন। দুর্গ-শহর, প্রাসাদ বানানোয় আকবর মনোযোগী ছিলেন। এতে একদিকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আগ্রা দুর্গ এর অন্যতম উদাহরণ। আজমির, লাহোর, কাশ্মীর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুর্গ (গড়) গুলিও আকবরের সময়ে তৈরি করা হয়। গুজরাট জয়ের স্মৃতিতে আকবর বানিয়েছিলেন বুলন্দ দরওয়াজা।

ফতেহপুর সিকরি এবং তার প্রাসাদ, মসজিদ, মহল, দরবার আকবরের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা। *ফতেহ্* মানে জয়। জয়ী সম্রাট হিসাবে আকবর ধ্বংস করেননি। বরং উদার মন আর সৌন্দর্যবোধ নিয়ে তৈরী করেছেন ফতেহপুর সিকরি। ভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্যরীতি মিশে গেছে সিকরিতে। আকবর যে সমস্ত ভারতের সম্রাট, কোনো বিশেষ ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের শাসক নন– তারই নমুনা ফতেহপুর সিকরি।

ছবি ৭.১১: ফতেহপুর সিকরির পঞ্চমহল বা বাদ্‌গির

জাহাঙ্গিরের সময়ে বাগান বানানোর উদ্যোগ আবার শুরু হয়। আগ্রায়, কাশ্মীরে বানানো বাগানগুলির কথা সম্রাট জাহাঙ্গির লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি* বইতে। এই সময়ে শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে একরকম কারুকার্য করার চল দেখা যায়। তাকে *পিয়েত্রা দুরা* বলে। জাহাঙ্গিরের সময়ে বানানো ইতিমাদ-উদ্ দৌলার সমাধি সৌধে পিয়েত্রা দুরা কারুকার্যের ব্যবহার দেখা যায়।

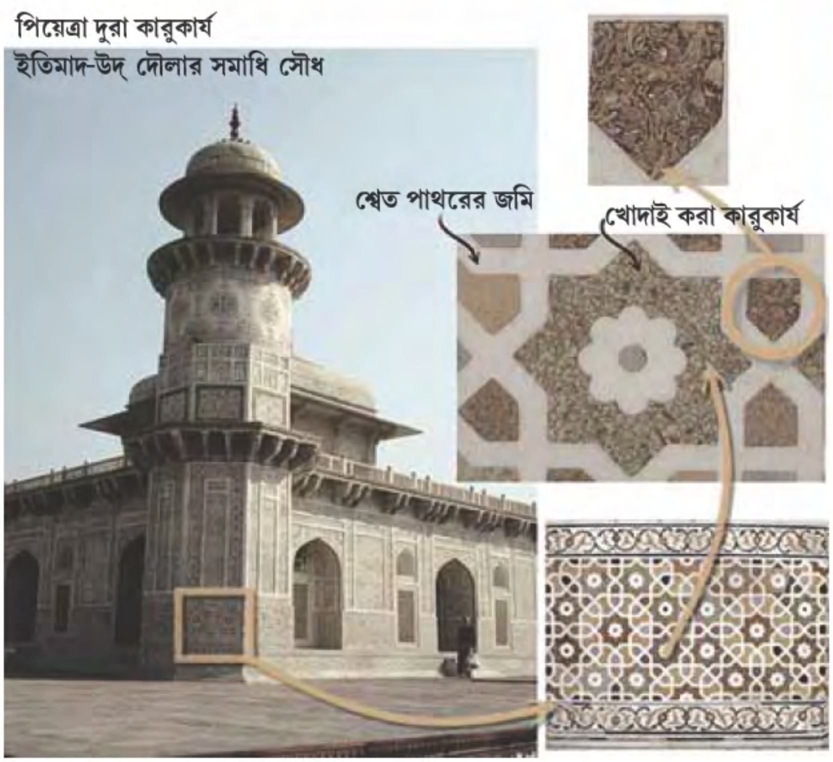

ছবি ৭.১২:
একটি মুঘলরীতির চাহার বাগ

ছবি ৭.১৩:
ইতিমাদ-উদ্ দৌলা-র সমাধি সৌধ, আগ্রা।

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাজমহল। সম্রাট শাহ জাহানের সময়ে বানানো এই স্মৃতিসৌধটি এক আশ্চর্য স্থাপত্য। পাথরের ব্যবহার, কারুকার্য, শিল্পরীতির দিক থেকে তাজমহলের তুলনা নেই। তার পাশাপাশি লালকেল্লা, জামি মসজিদ এবং আগ্রা দুর্গের ভিতরে মোতি মসজিদ প্রভৃতি শাহ জাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্পে উন্নয়নের সাক্ষী।

ছবি ৭.১৪ : তাজমহল, আগ্রা

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্যের মধ্যে নানান বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব সামলাতে জেরবার বাদশাহ স্থাপত্য বানানোর দিকে মন দিতে পারেননি। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায়। তাই স্থাপত্যের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করাও সম্ভব ছিল না। তবে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে লালকেল্লার ভিতরে একটি মসজিদ বানানো হয়। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গাবাদে তাঁর বেগমের স্মৃতিতে নির্মিত বিবি-কা মকবারা ঐ সময়ের বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প।

মুঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব গোটা দেশ জুড়েই লক্ষ্য করা যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের অনেক আঞ্চলিক স্থাপত্যশিল্পেও সেই ছাপ স্পষ্ট।

দিল্লির সুলতান ও মুঘল বাদশাহদের সময়ের তৈরি স্থাপত্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

আঞ্চলিক স্থাপত্য

সুলতানি এবং মুঘল যুগে ভারতের নানা অঞ্চলে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে গুজরাট, বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যশিল্প বিখ্যাত।

গুজরাটের স্থাপত্যগুলি সাংস্কৃতিক মিলমিশের নিদর্শন। এতে ইসলামীয়, হিন্দু এবং জৈন নির্মাণশৈলীর স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আহমেদাবাদের জামি মসজিদ।

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের প্রধান দিক হলো একাধিক দুর্গ ও দুর্গ-শহর। গুলবর্গা দুর্গ (১৩১৮ খ্রিঃ) এর অন্যতম উদাহরণ। বিদরের দুর্গ ও প্রাসাদ গুলিতে ইরানি ধাঁচের দেওয়ালচিত্র দেখা যায়। যদিও এদের অধিকাংশই এখন ভেঙ্গে গেছে। তবে পালিশ করা চুনের দেওয়ালে সোনালি, লাল ও নীল রং-এর অপূর্ব সব খোদাই কাজ এখনও বর্তমান। আহমেদনগরের চাঁদ বিবির প্রাসাদ একটি টিলার উপর আটকোণা ভিত্তির উপর নির্মিত। বিজাপুরে মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৭-'৫৬ খ্রিঃ) নির্মিত গোল গুম্বদ একটি সুন্দর স্থাপত্যকার্য। এর গম্বুজটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো গম্বুজ। কুতুবশাহি আমলের হায়দরাবাদের চারমিনার (১৫৯১খ্রিঃ) আঞ্চলিক স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন।

ছবি ৭.১৫:
মোতি মসজিদ, লালকেল্লা, দিল্লি। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য এই মসজিদটি বানানো হয়েছিল।

ছবি ৭.১৬ :
চারমিনার, হায়দরাবাদ

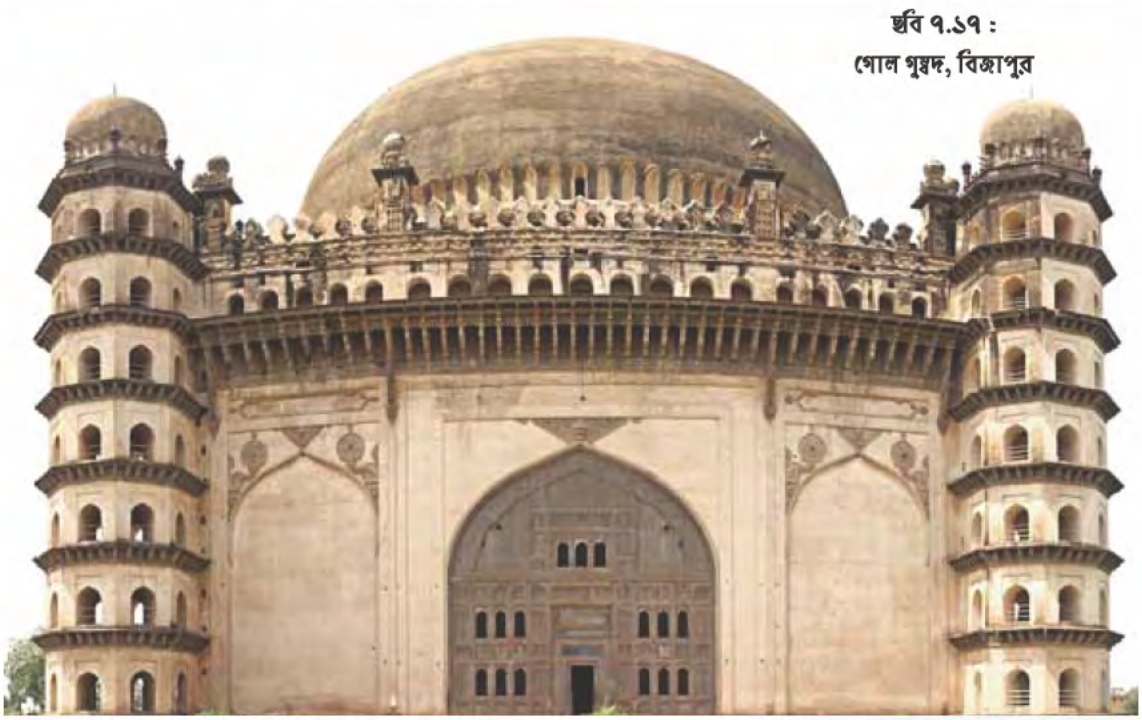

ছবি ৭.১৭ :
গোল গুম্বদ, বিজাপুর

ছবি ৭.১৮ :
বিঠল মন্দিরের পাথরের রথ,
হাম্পি, বিজয়নগর

বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পি সমেত বহু জায়গাতেই মন্দির এবং ইমারতগুলিতে দেখা যায় হিন্দু এবং ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির মেলামেশা। কল্পনাশক্তি, কারুকার্য ও শৈলীর দিক দিয়ে এগুলি অতুলনীয়।

বাংলার স্থাপত্যরীতি

মুসলমান শাসন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এই সময়ে বাংলায় কাঠামো নির্মাণের মূল গঠনভঙ্গি ছিল ইসলামি রীতি অনুসারে। আর বাইরের কারুকার্য ও কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলার লৌকিকরীতির ছাপ দেখা যায়।

ইমারতে ইঁটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। বাড়ি এবং বেশির ভাগ মন্দির ঢালু ধাঁচে তৈরি করা হতো। এর পিছনে যুক্তি ছিল বেশি বৃষ্টিতে জল দাঁড়াতে পারবে না। এই বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির নাম *বাংলা*। অঞ্চলের নামেই স্থাপত্যরীতির নাম হওয়ার এটা একটা উদাহরণ। পুরোনো অনেক মন্দিরের কাঠামো এই ধাঁচেই তৈরি হতো। এমনই দুটি কাঠামো পাশাপাশি জুড়ে দিলে তাকে *জোড়-বাংলা* বলা হতো।

তোমাদের অঞ্চলে কোনো পুরানো স্থাপত্য আছে? থাকলে বন্ধুরা মিলে সেখানে যাও। সেটা কবে তৈরি, কেমন ভাবে তৈরি সেসব বিষয়ে ভালো করে জানো। সেসব খাতায় লিখে রাখো ও স্থাপত্যটির একটি ছবি আঁকো।

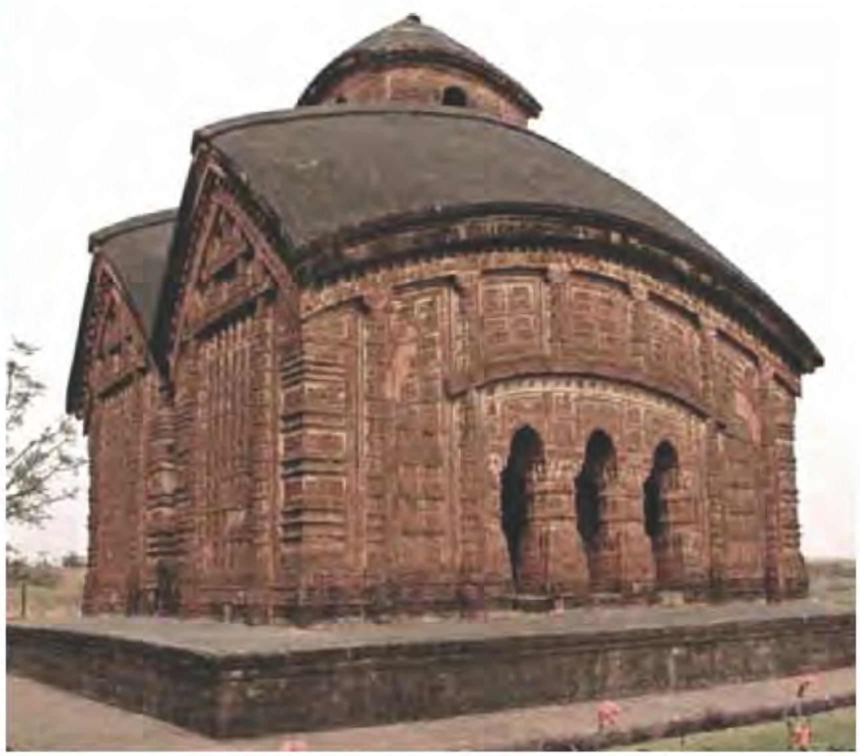

ছবি ৭.১৯ :
জোড়-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর
(১৬৫৫খ্রিঃ)

চাল বা চালা-ভিত্তিক মন্দির বানানোর রীতিও বাংলায় দেখা যায়। মন্দিরের মাথায় ক-টি চালা আছে, সে হিসাবেই কোনও মন্দির একচালা, কখনো দো-চালা, কখনো বা আট-চালা হতো। ইসলামীয় স্থাপত্যের ধাঁচে চালা গুলির মাথায়ও মাঝে মধ্যেই খিলান, গম্বুজ বানানো হতো।

সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর উপর একাধিক চূড়া দিয়ে তৈরি মন্দিরও এই সময় বাংলায় বানানো হয়। সেই গুলির নাম *রত্ন*। একটি চূড়া থাকলে সেটি একরত্ন মন্দির, পাঁচটি চূড়া থাকলে পঞ্চরত্ন মন্দির।

এই মন্দির গুলির বেশির ভাগের দেওয়ালে পোড়ামাটির বা *টেরাকোটার* কাজ করা হতো। পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এই যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসকে তিনটি মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১২০১-১৩৩৯ খ্রিঃ) বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধির ভগ্নাবশেষ, এবং বসিরহাট-এ ছড়িয়ে থাকা কিছু স্তূপ ছাড়া এসময়কার কোনও স্থাপত্যই আজ আর নেই।

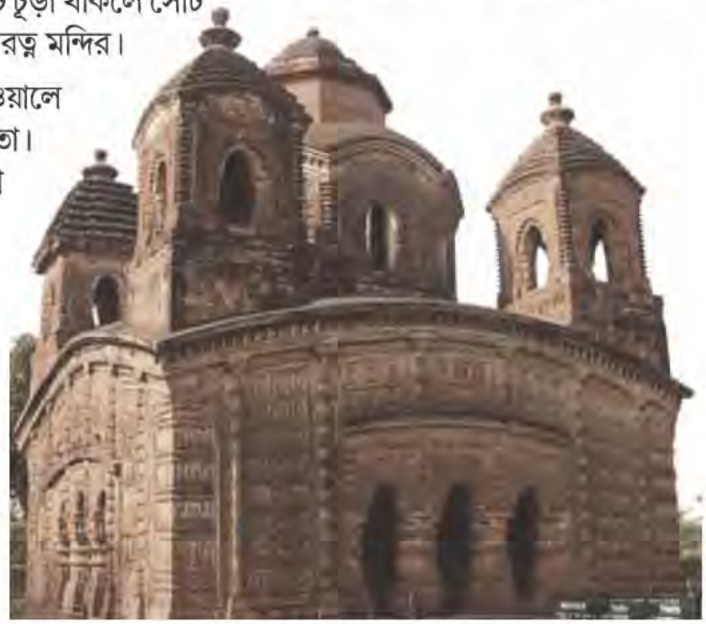

ছবি ৭.২০ : পঞ্চরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর (১৬৪৩খ্রিঃ)

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৩৩৯-১৪৪২খ্রিঃ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হলো মালদহের পাণ্ডুয়ায় সিকান্দর শাহের বানানো আদিনা মসজিদ। এ ছাড়া, হুগলি জেলায় ছোটো-পাণ্ডুয়ার মিনার ও মসজিদ এবং গৌড়ের শেখ আকি সিরাজের সমাধি এই পর্যায়ের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।

ছবি ৭.২১ : ফিরোজ মিনার, গৌড়

তৃতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৫৩৯খ্রিঃ) বাংলায় ইন্দো-ইসলামি রীতির স্থাপত্য শিল্প সবচেয়ে উন্নত হয়। পাণ্ডুয়ায় সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহর (যদু) সমাধি (একলাখি সমাধি নামে বিখ্যাত) এই ধাঁচের সেরা নিদর্শন। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও, টেরাকোটার গম্বুজ ও তার অর্ধগোল আকৃতির জন্য এটি বাংলায় ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের উন্নতির অন্যতম নজির। বরবক শাহের আমলে তৈরি গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা এসময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ। এছাড়াও সে সময়ের রাজধানী গৌড়ের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের নজির হলো তাঁতিপাড়া মসজিদ, গুম্মত মসজিদ ও লোটান মসজিদ। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ২৬ মিটার উচ্চতার ফিরোজ মিনার। ইঁট ও টেরাকোটার কাজ ছাড়া, এই মিনারটি সাদা ও নীল রং-এর চকচকে টালি দিয়েও অলংকৃত। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বড়ো সোনা মসজিদ গৌড়ের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ।

৭.৬ সুলতানি ও মুঘল যুগের শিল্পকলা

দরবারি চিত্রকলা

সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার আগেও ভারতে ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। মন্দির ও গুহার দেওয়ালচিত্র তার সাক্ষী হয়ে আছে। তবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সুলতানি ও পরে মুঘল যুগে মৌলিক পরিবর্তন হয়। আস্তে আস্তে নানা চিত্ররীতির মিলমিশ লক্ষ করা যায় চিত্রকলায়। বিভিন্ন অঞ্চলেও নানরকম আঞ্চলিক চিত্ররীতি তৈরি হতে দেখা যায়।

সুলতানি যুগে বই এবং পাণ্ডুলিপিতে ছবি আঁকার চল দেখা যায়। সুন্দর হাতের লেখা, রঙিন ছবি সব মিলিয়ে বইগুলি সুদৃশ্য হয়ে উঠত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলিতে এই প্রথার ছাপ পড়েছিল। *কল্পসূত্র*, *কালচক্রকথা*, *চৌরপঞ্চাশিকা* প্রভৃতি বইগুলিতে এধরণের লেখা ও ছবির ব্যবহার দেখা যায়। পারসিক মহাকাব্য *শাহনামা*-র ভারতীয় সংস্করণেও এধরনের রঙিন ছবি রয়েছে। তবে এই ছবিগুলির বিশেষ নিদর্শন দেখা যায় না।

এই চিত্রশিল্পীরা প্রধানত পশ্চিম ভারতের (গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল) বাসিন্দা ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। সুলতানি চিত্রশিল্পের ধারা মুঘল যুগে আরও পরিণত ও উন্নত হয়ে ওঠে।

বইতে ছবি আঁকার বা অলংকরণের প্রথা সম্রাট বাবরের সময়েও দেখা যায়। এ ব্যাপারে হুমায়ুনের খুবই উৎসাহ ছিল। ইরান ও আফগানিস্তানে থাকার সময়ে তিনি আবদুস সমাদ ও মির সঈদ আলির কাজ দেখেন। মুগ্ধ হুমায়ুন পরে দিল্লিতে ফিরে তাঁদের নিয়ে মুঘল কারখানা খোলেন। সেই কারখানায় বইগুলি অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখা ও অলংকরণ দিয়ে সাজানো হতো। *হমজানামা* বই-এর অলংকরণের কাজ হুমায়ুনের সময়েই শুরু হয়। সেই কাজ শেষ হয় আকবরের আমলে। এমন আরো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে *রজমনামা*, *নল-দময়ন্তী*, *জাফরনামা* ইত্যাদিতে।

সুন্দর হাতের লেখার শিল্প সেকালে খুব চর্চা হতো। একে ইংরাজিতে বলে Calligraphy (ক্যালিগ্রাফি)। বাংলায় হস্তলিপিবিদ্যা বা হস্তলিপিশিল্প বলা যেতে পারে। ছাপাখানার রেওয়াজ ছিল না তখন। হাতে লেখা বইগুলিই ছিল শিল্পের নমুনা।

ছবি ৭.২২:
মুঘল কারখানায় বই অলঙ্করণের কাজ করছেন শিল্পীরা।

সম্রাট আকবরের সময়ে বইয়ের অলংকরণ শিল্পের আরও নমুনা পাওয়া যায়। *তুতিনামা*, *রজমনামা* (মহাভারতের ফারসি অনুবাদ) প্রভৃতি বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সাজানো হতো সূক্ষ্ম হস্তলিপি এবং ছবি দিয়ে। আকার এবং আয়তনে ছোটো এই ছবিগুলিকে বলা হয় মিনিয়েচার (Miniature)। মিনিয়েচার কথাটা ইংরাজি, তবে সেটাই বেশি প্রচলিত। বাংলায় তাকে অণুচিত্র বলা যেতে পারে। সোনার রঙ এবং অন্যান্য রঙের ব্যবহার হতো বইতে। তাতে জ্বলজ্বল করত পৃষ্ঠাগুলি। লেখার চারপাশে নানারকম অলংকরণ করা হতো।

বই অলংকরণের পাশাপাশি প্রতিকৃতি আঁকাও আকবরের সময় থেকে শুরু হয়। জাহাঙ্গিরের আমলে প্রতিকৃতি আঁকার উন্নতি হয়। সে সময়ে থেকেই ইউরোপীয় ছবি আঁকার রীতি-নীতির ছাপ মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল। ছবিতে বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদ এর ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। ভারতের প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণী ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে আসে।

ছবি ৭.২৩ : বাদশাহ জাহাঙ্গিরের হাতে পৃথিবীর ভার (সার্বভৌম ক্ষমতা) তুলে দিচ্ছেন বাদশাহ আকবর। উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাওয়ার প্রতীক এই কাল্পনিক ছবিটি।

জাহাঙ্গিরের আমলেই শিল্পীরা প্রথম ছবিতে স্বাক্ষর (সই) করতে শুরু করেন। তাতে বোঝা যেত কোন ছবি কার আঁকা।

বাদশাহি বা অভিজাত নারীরা অনেকেই ছবি আঁকার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তবে বাইরের শিল্পীদের দিয়ে অন্দরমহলের মহিলাদের ছবি আঁকানোর বিশেষ প্রচলন ছিল না। নাদিরা বানু, সাহিফা বানুর মতো মুঘল-নারীরা নিজেরাও ছবি আঁকতেন।

স্থাপত্যের পাশাপাশি শাহ জাহানের চিত্রশিল্পেও উৎসাহ ছিল। ছবির মধ্যে কাছে-দূরে বোঝানোর পদ্ধতির ব্যবহার এই সময়ে শুরু হয়। *পাদশাহনামা* গ্রন্থের অলংকরণ এই সময়ের বিখ্যাত কাজ। এইসব ছবিগুলি শিল্প হিসাবে অসাধারণ। অন্যদিকে সমকালীন ইতিহাসেরও উপাদান হয়ে উঠেছে ছবিগুলি।

শাহ জাহানের পরে মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতি বড়ো একটা দেখা যায়না। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে দরবারি শিল্পীদের কাজ ব্যাহত হয়। তাদের অনেকেই মুঘল দরবার ছেড়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকদের দরবারে চলে যান। বাদশাহ, অভিজাতরাই বিষয়বস্তু হিসাবে মুঘল দরবারি ছবিগুলিতে বেশি ছাপ রেখেছিল। তবে তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, তাদের কাজকর্মও ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

টুকরো কথা

মুঘল চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবরণ

"মনে করা হয় যে, সাদা এবং কালো সব রঙের উৎস। এ-দুটিকে দেখা হয় পরস্পর বিরোধী রং হিসেবে এবং অন্যান্য রঙের অংশরূপে। তার ফলে যখন অনেকটা পরিমাণে সাদা মেশানো হয় কিছুটা ভেজাল কালোর সঙ্গে, উৎপন্ন হয় হলুদ রং। সাদা ও কালো সমান পরিমাণে মেশালে আসে লাল। যখন অনেকটা বেশি পরিমাণে কালো রঙের সঙ্গে মেশানো হয় সাদা, পাওয়া যায় নীলচে সবুজ। এদেরকে মিশিয়েই অন্যান্য রঙও পাওয়া সম্ভব ..." — আবুল ফজল আল্লামি, *আইন-ই আকবরি*, আইন ৩৪ ('রঙের চরিত্র প্রসঙ্গে')।

কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য মিলিয়ে ছবি আঁকাকে বলে *তসভির*। বাদশাহ আকবর তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই এই ধরনের ছবি আঁকার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলে বহু চিত্রকরপরিচিতি পায়। প্রতি সপ্তাহে দারোগা ও কেরানিরা সমস্ত চিত্রকরদের ছবি বাদশাহের সামনে পরিবেশন করত। তিনি তখন ছবির শৈল্পিক গুণের বিচার করে পুরস্কার ঘোষণা করতেন বা বাড়িয়ে দিতেন তাদের মাস মাইনে।

মুঘল শিল্পীদের ছবিতে যেন প্রাণহীন বস্তুও প্রাণ পায়। একশোর বেশি চিত্রকররা হয়ে উঠেছিলেন ছবি আঁকায় অতুলনীয়।

এই শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পারস্যের তাবরিজের **মির সঈদ আলি**, সিরাজের **খোয়াজা আবদুস সামাদ** যাঁর ছদ্মনাম ছিল 'শিরিন কলম' অর্থাৎ মিষ্টি কলম, **দসবন্ত** এবং **বসওয়ান**। দসবন্ত ছিল এক পালকি বাহকের ছেলে। তাঁর সমস্ত জীবন নিবেদিত ছিল এই শিল্পে। আঁকতে সে এতই ভালোবাসত যে দেয়ালেও এঁকে ফেলত মানুষের ছবি। স্বয়ং বাদশাহের সুনজরে পড়েন দসবন্ত। কালক্রমে আঁকার দক্ষতায় বাকি সব শিল্পীদের সে ছাড়িয়ে যায়। অকালে তার মৃত্যু হলেও দসবন্তের ছবিগুলো তাঁর প্রতিভার সাক্ষী। ছবির পটভূমিকা বা নানান অবয়ব আঁকতে, রঙের ব্যবহারে, প্রতিকৃতি আঁকাতে বা অন্যান্য বহু শাখায় বসওয়ানের দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

ছবি ৭.২৪:
চিত্রনন্দ ও উদীয় নামের দুটি যুদ্ধের হাতি লড়াই করছে। *আকবরনামা*-র একটি মুঘল মিনিয়েচার।

আঞ্চলিক চিত্রকলা

মুঘলদের দরবারি চিত্রশিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ছবি আঁকার রীতি দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৮৬-১৬২৭খ্রিঃ) চিত্রশিল্পের সমঝদার ছিলেন।

রাজস্থান এবং পাহাড়ি অঞ্চলে (জম্মু, কাশ্মীর, কাংড়া প্রভৃতি) নানান ছবি আঁকার রীতি দেখা যায়। মুঘল রীতি ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই আঞ্চলিক চিত্ররীতিগুলিতে মিলেমিশে গেছে। ছবির বিষয়, রঙের ব্যবহারের দিক থেকে এদের আলাদা মর্যাদা।

পৌরাণিক নানা দৃশ্য এবং বিষয় এই ছবিগুলির মূলকেন্দ্র ছিল। বিষয়বস্তু হিসাবে রাধা-কৃষ্ণের খুব ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি প্রতিকৃতি আঁকার চর্চাও জনপ্রিয় ছিল। রাজপুত রাজারা ছাড়াও জমিদাররাও নিজেদের এবং তাঁদের সভার ছবি আঁকাতেন। তবে এই প্রতিকৃতিগুলির পটভূমি অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ছিল।

টুকরো কথা

'জগতের বিস্ময়'

বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ-র সময়ে সেরা চিত্রশিল্পী ছিলেন ফারুক হোসেন। তিনি প্রথমে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। ১৫৯০ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফারুখ হোসেন হঠাৎ মুঘল কারখানা থেকে উধাও হয়ে যান। মনে করা হয়, এই সময়েই তিনি ইব্রাহিমের জন্যে ছবি আঁকতেন। পরে হোসেন আবার মুঘল কারখানায় ফিরে যান। জাহাঙ্গির তাঁকে নাদির আল-অস্‌র (জগতের বিস্ময়) উপাধি দেন।

ছবি ৭.২৫: আলোচনারত রাধা-কৃষ্ণ, কাংড়া চিত্র।

সংগীত ও নৃত্য

সুলতানি এবং মুঘল আমলে সংগীত এবং নৃত্য শিল্পের চর্চাও হতো। ভারতবর্ষের সংগীত চর্চা আর ইরানি সংগীতচর্চার ধারা মিলেমিশে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই সুফি পিররা *সমা* গানকে তাঁদের সাধনার অংশ করে তোলেন। পাশাপাশি ভক্তিধর্মের হাত ধরেও নানান আঞ্চলিক সংগীতচর্চা গড়ে ওঠে। কবীর, নানক, মীরাবাঈ সকলেই গানকে তাঁদের ঈশ্বর সাধনার অংশ করে নিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে কীর্তনের মাধ্যমেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হতো।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা জারি ছিল। সেই সময়ের দুটি বই থেকে এবিষয়ে জানা যায়। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিও সংগীতচর্চার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। সংগীত বিষয়ে লেখা বই অনেক সময়ে রাজা, সুলতানদের উৎসর্গ করা হতো। জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শরকিকে *সংগীত শিরোমণি* (১৪২০ খ্রিস্টাব্দ) রচনাটি উৎসর্গ করা হয়। হোসেন শাহ শরকি নিজে সংগীত রাগ তৈরি করেছিলেন। তাকে হোসেনি বা জৌনপুরি রাগ বলে।

গোয়ালিয়রের রাজা মান সিং তোমর (১৪৫০-১৫২৮খ্রিঃ) ছিলেন সংগীতের সমঝদার। তাঁর সময়ে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদগুলি সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়। *মান-কৌতূহল* সেই সময়ের একটি বিখ্যাত সংগীত গবেষণা গ্রন্থ। বৈজু বাওরা এই আমলের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী।

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সেরা সংগীতপ্রেমী ছিলেন আকবর। তাঁর দরবারের গুণীজনদের মধ্যে সংগীতজ্ঞরাও ছিলেন। আবুল ফজলের লেখায় ছত্রিশজন সংগীতশিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তানসেন (১৫৫৫-১৬১০খ্রিঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর সৃষ্টি দীপক, মেঘমল্লার প্রভৃতি রাগ। শোনা যায় যে, তাঁর সংগীত সাধনা এমনই ছিল যে, তাতে নিজে থেকে প্রদীপ জ্বলে উঠত, কখনওবা অকালে বর্ষা নামত।

শাহ জাহানের সময়েও মুঘল দরবারে সংগীতের প্রচলন ছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথম দশ বছর সংগীতশিল্পে উৎসাহী ছিলেন। তারপর সরকারি ভাবে সংগীতের পৃষ্টপোষণা বন্ধ হয়ে যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরেও সংগীতের ঐতিহ্য বজায় ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক সংগীতের সমঝদার ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সেই ঐতিহ্য আজও চলেছে।

টুকরো কথা

আমির খসরু

সুলতানি আমলে আমির খসরু হিন্দুস্তানি এবং ইরানি সংগীতের মিলন ঘটান খসরু। দিল্লির সুলতান থেকে সুফি পির— খসরুর জনপ্রিয়তা ছিল সবাইয়ের কাছে। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য জয়ের পরে কর্ণাটকী সংগীত শিল্পীরা দিল্লিতে এলে তাদের কাছেই আমির খসরু ভারতের প্রাচীন সংগীতচর্চার ব্যাকরণ শেখেন। শাস্ত্রীয় সংগীত বিষয়ে খসরুর অনেক লেখাও আছে। খেয়াল, তরানা, কওয়ালি প্রভৃতি সংগীতরীতি আমির খসরুর সৃষ্টি। মনে করা হয় সেতার, তবলা, পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রগুলিও তাঁর বানানো। এ ছাড়া আমির খসরু অনেক গজল এবং গীতিকাব্য লিখেছিলেন।

নৃত্যশিল্প : মণিপুরী নৃত্য

ভারতবর্ষে ধ্রুপদী নাচ মূলত ছ-টি : ভরতনাট্যম, কথাকলি, ওড়িশি, কুচিপুড়ি, কত্থক এবং মণিপুরী। তারমধ্যে নবীনতম মণিপুরী নৃত্যশৈলীর কথা আমরা জানব। অষ্টাদশ শতকে ভক্তির প্রবল প্রভাব পড়ে মণিপুরী সংস্কৃতিতে। তার ফলে তাদের আদি নৃত্য ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় ভক্তিরস। সৃষ্টি হয় সংকীর্তন এবং রাসলীলা। বৈষ্ণব পদাবলির ভিত্তিতে রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রাসলীলাগুলি তৈরি করা হয়।

মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের হাতেই মণিপুরী রাসলীলার ধারাগুলির বিকশিত হয়। নাচের জন্য কুমিল পোশাকও তিনি তৈরি করেন। সংকীর্তনে পুঙ্গ নামের ঢোল বাজিয়ে মূলত ছেলেরাই নাচে।

ছবি ৭.২৬: মণিপুরী নৃত্যের একটি ভঙ্গিমার আঁকা ছবি।

৭.৭ ভাষা ও সাহিত্য

৭.৭.১ আরবি ও ফারসি

ইসলামের জন্ম আরব দেশে। তাই তার প্রচলন আরবি ভাষার মাধ্যমেই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কিন্তু আরবি ভাষার প্রচলন ছিল সীমিত। আরবির কদর ছিল কেবল ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে। বেশ কিছু সরকারি বই আরবি ভাষায় লেখা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে লেখা *ফতাওয়া-ই আলমগিরি*। এটি তখনকার আইন ব্যবস্থার একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল। এটিকে কেউ কেউ ভারতে মুসলিম শাসনে লেখা শ্রেষ্ঠ মুসলমানি আইনের বই বলে থাকেন।

মধ্যযুগের ভারতে বরং আমরা দেখি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তা। ভারতে ফারসি সাহিত্যের শুরু সুলতানি শাসনের হাত ধরে।

দশম শতাব্দীতে তুর্কিরা যখন ভারতে আসে তখন থেকেই বোধ হয় ফারসির প্রচলন ঘটে। এর আগে থেকেই অবশ্য ফারসি প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে মধ্য এশিয়া এবং ইরানে প্রচলিত ছিল। সেখানে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ভাষা বহুভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর থেকে ভাবা হয়তো ভুল নয় যে তুর্কিরা ফারসি ভাষার শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল। হয়তো সেই কারণেই ভারতে এই ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তুর্কিরা। কুতবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিশ ফারসি ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে খলজি যুগের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই লাহোর শহর হয়ে ওঠে ফারসি ভাষাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সেসময় ফারসি সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের মধ্যে আমির খসরুর লেখা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। ১২৫২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বদাউনের কাছে পাটিয়ালিতে জন্ম খসরুর। তিনি চিরকাল তাঁর ভারতীয়ত্বের গর্ব করতেন। খসরুর এরকম ভারত-প্রীতি থেকে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। তা হলো, কীভাবে ধীরে ধীরে তুর্কি শাসকরা তথাকথিত আক্রমণকারীর ভূমিকা বদলে এ দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার মানসিকতায় পৌঁছে গিয়েছিল। খসরু অনেক কবিতা ও কাব্য লেখেন। সারাজীবন ফারসি কাব্য লেখার নানান পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান তিনি। খসরু ফারসি সাহিত্যের এক নতুন রচনাশৈলী *সবক-ই হিন্দ* -এর আবিষ্কারক।

এ সময়ে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও ফারসি হয়ে ওঠে অতি পছন্দের ভাষা। এই ভাষার বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা ছিলেন মিনহাজ- ই সিরাজ, ইসামি এবং জিয়াউদ্দিন বারনি। মধ্যযুগে বহু রচনা মূল সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এই ধারার প্রথম লেখক ছিলেন জিয়া নকশাবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা গল্পমালা ফারসিতে অনুবাদ করেন। তার নাম দেন *তুতিনামা*। এ ছাড়াও সে সময়কার কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবেদিনের উৎসাহে কলহন-এর *রাজতরঙ্গিনী* এবং *মহাভারত* ফারসিতে অনুবাদ করা হয়।

ফারসিতে অনুবাদের এই রেওয়াজ সমানভাবে চলতে থাকে তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি আমলেও। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে তার রাজধানী কিছু সময়ের জন্য দেবগিরি বা দৌলতাবাদে চলে যায়। তার ফলে দক্ষিণ ভারতে ফারসি চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের বাহমনি সুলতানেরাও ছিলেন ফারসি ভাষা চর্চায় খুব আগ্রহী। সেই কারণে বাহমনি-রাজধানী গুলবর্গা এবং বিদর হয়ে উঠেছিল ফারসি ভাষা এবং সাহিত্যের এক নামি কেন্দ্র।

মনে রেখো

কুতুবউদ্দিন আইবকের সময়ের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন হাসান নিজামি। তাঁর লেখা ইতিহাসের নাম তাজ-উল মাসির। সেই বইতে নিজামি লিখেছেন— 'সব যুদ্ধ জয়ের পরেই চলতি প্রথা ছিল বিরোধীদের দুর্গ ও অন্যান্য ঘাঁটিগুলি বিশাল হাতিদের পায়ে পিষে গুঁড়ো করে দেওয়া।'

শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সব দেশেই জয়ীরা পরাজিতদের সব শক্তি শেষ করার জন্য এসব করত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রিস্টান সব ধর্মের শাসকরাই একাজ করেছেন। এটা আসলে রাজনৈতিক শক্তি দেখানোর একটা চেষ্টা।

ফারসির কার্যকারিতা এবং জনপ্রিয়তা আরো বেড়েছিল মুঘল আমলে। সম্রাট বাবর ছিলেন তুর্কি এবং ফারসি দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত। তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই বাবরি* বা *বাবরনামা* লেখা হয়েছিল তুর্কি ভাষাতে। এই বইটি ফারসিতেও অনূদিত হয়েছিল। হুমায়ুনও ছিলেন ফারসিপ্রেমী। গুলবদন বেগমের লেখা *হুমায়ুননামা* ফারসি ভাষায় লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইরান থেকে যখন ভারতে ফেরেন সম্রাট হুমায়ুন, তাঁর সঙ্গে আসেন বহু কবি-সাহিত্যিক। যেমন কাসিম খান মৌজি। ইনি ছিলেন হুমায়ুন এবং আকবরের সভাকবি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পারস্য থেকে বহু কবি এবং সাহিত্যিক এসে মুঘলদের দরবারে ভিড় জমান। পারস্যের সফাবি সাম্রাজ্য তখন পতনের মুখে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওখানকার গুণী মানুষজন চলে আসে ভারতে। পারস্য এবং ভারতের এক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটেছিল ফারসি ভাষার মধ্য দিয়ে। এতে বিশেষ লাভ হয় ভারতীয় সাহিত্যের। এক বিশিষ্ট কাব্যরীতির জন্ম হয় ফৈজি, উরফি, নাজিরি, বেদিলের মতো কবিদের লেখায়।

সম্রাট আকবরের আমলে ফারসি ভাষা এবং সাহিত্য ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। তাঁর সময়ের রচনাগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো ইতিহাস লেখা। দ্বিতীয়টি অনুবাদ সাহিত্য। তৃতীয়টি ছিল কবিতা। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ছিল আবুল ফজলের *আকবরনামা* এবং *আইন-ই আকবরি*, বদাউনির *মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ* এবং নিজামউদ্দিন আহমেদের *তবকাত-ই আকবরি* ইত্যাদি।

আকবরের মতো সম্রাট জাহাঙ্গিরও ফারসির অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারতের নামি কবি ছিলেন তালিব আমুলি। শাহ জাহানের সময়েও এই চর্চা সমানভাবে চলতে থাকে। এর প্রমাণ আবদুল হামিদ লাহোরির মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিকের লেখা। ফারসিতে অনুবাদের এই ধারা একেবারে কমে আসে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। মনে করা হয় যে, তিনি পারস্যদেশ থেকে আসা কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি তেমন সদয় ছিলেন না। তবে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জৈবউননিসা আরবি এবং ফারসি ভাষা ভালোবাসতেন ও তাতে কবিতাও লিখতেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিজেও এই ভাষা ভালোমতোই জানতেন। তার প্রমাণ ফারসিতে লেখা তাঁর কিছু চিঠিপত্র।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা যদি ভাবো যে, ফারসি ভাষা শুধু মুসলমান সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল— তবে তা ভুল হবে। অন্যরাও এই ভাষায় সমান পটু ও আগ্রহী ছিল। এর প্রমাণ রয়ে গেছে ঈশ্বরদাস নাগর, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বা ভীমসেন বুরহানপুরির মতো হিন্দু লেখকদের রচনা।

টুকরো কথা

আকবরের আমলে অনুবাদ

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আকবরের নিজের উৎসাহে কয়েকজন লেখক মহাভারতের নানান অংশ ফারসিতে অনুবাদ করে। রজমনামা নামে সেটি বিখ্যাত। বদাউনি করেছিলেন রামায়ণের অনুবাদ। হাজি ইব্রাহিম সিন্দি ফারসি ভাষায় বেদের অনুবাদ করেন। গ্রিক ভাষায় লেখা বেশ কিছু বইও ফারসিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। রাজা টোডরমল ভাগবৎপুরাণ অনুবাদ করেন ফারসিতে।

৭.৭.২ বাংলা সাহিত্য

সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে কেমন ছিল বাংলা ভাষা তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে সেই সময়কার কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এর ভাষা থেকে সুলতানি আমলের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু হলো বাংলায়। সেই সময় থেকে বাংলা ভাষায় লেখালেখির উদাহরণ পাওয়া যায়। ঐ ধারা বাকি সুলতানি এবং মুঘল আমলে বজায় ছিল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত কেমন ছিল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য? আজকের মতো তখনও বাংলা ভাষা ছিল নানা রকম। তখনকার সাহিত্যে দেবদেবীর মহিমা প্রচারের ছাপ ছিল; কিছু কিছু গীতিকায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও ধরা থাকত।

যা লেখা হতো, তার বেশিরভাগই সুর করে গাওয়া হতো। তাই এই সময়ের অনেক লেখালেখিকে *পাঁচালি* বলা হয়। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ বা দেবদেবীর পাঁচালি সবই গাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

ভক্তিধর্মের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে খুব গভীর। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ নিয়ে অনেক সাহিত্য লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কাব্য লেখার চল ছিল। তার পাশাপাশি ছিল রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে পদ-কবিতা লেখার ধারা। তাকেই বলে পদাবলি সাহিত্য।

রামায়ণ, মহাভারত সেই সময়েও খুব জনপ্রিয় ছিল। ঐ দুই মহাকাব্যের নানা দিক নিয়ে অনেকেই এই সময়ে কাব্য লিখেছিলেন। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ তো ছিলই। *রামায়ণ* অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। কাশীরাম দাস *মহাভারত*-এর অনুবাদ করেছিলেন। ভাগবত-এর খানিক অংশ সে যুগের সরল বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সেই অনুবাদটির নাম *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। অনুবাদটি করেন মালাধর বসু।

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি পুরোনো এবং প্রধান ধারা ছিল *মঙ্গলকাব্য*। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম এইসব দেব-দেবীর পুজোর চলনতো ছিলই। সেই পুজোর সময়ে ঐ দেব-দেবীর মহিমা শোনানো হতো গান গেয়ে। সেই গানগুলোর ভিতরে একটা গল্প থাকত। সেই গল্পগুলোকে ধরে বেশ কিছু সাহিত্য লেখা হয়। সেগুলোকেই মঙ্গলকাব্য বলে। 'মঙ্গল' মানে 'ভালো'। যে দেবতা বা দেবীর নামে মঙ্গলকাব্য লেখা হতো, তার পুজো করলে ভালো হবে—সেটাই

টুকরো কথা

মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ

রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত সবগুলোই আসলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু, যখনই কবিরা সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তখনই তার ভিতরে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সেই সময়কার বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে ঐ অনুবাদ গুলিতে। বাল্মীকির লেখা রামায়ণের রাম আর কৃত্তিবাসের রামের চরিত্র অনেক আলাদা।

ছবি ৭.২৭ :
মনসামঙ্গল কাব্যের একটি ছবি। ছবিটিতে বেহুলা মৃত লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসে যাচ্ছে।

বলার চেষ্টা ছিল। চণ্ডীদেবীকে নিয়ে লেখা হয়েছিল *চণ্ডীমঙ্গল*। দেবী মনসাকে ঘিরে লেখা হয়েছিল *মনসামঙ্গল*। ধর্মঠাকুর ছিলেন *ধর্মমঙ্গল*-এর কেন্দ্রে। অনেক কবিই মঙ্গলকাব্য লিখেছেন। তবে সবগুলিতেই গল্পের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ দেবী বা দেবতার পুজো করার কথা বলা হয়েছে।

চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি দেবী-দেবতা সমাজের নীচু তলার মানুষের পুজো পেতেন। তাই এদের নিয়ে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিতে গরিব, সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও পাওয়া যায়। শিবকে নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়েছে। সেই লেখাগুলিকে *শিবায়ন* বলে। পুরাণে শিব বিষয়ে যে কাহিনি তার সঙ্গে শিব-দুর্গার ঘর-সংসারের কথা জুড়ে শিবায়ন কাব্যগুলি লেখা হয়েছে। গরিব শিব-দুর্গা এবং তাদের জীবনের কথা এসেছে ঐ লেখাগুলিতে। শিব সেখানে চাষবাস করে রোজগারের চেষ্টা করে। এই লেখাগুলিতে সেই সময়ের বাংলার গরিব কৃষক পরিবার যেন শিব-দুর্গার পরিবার হয়ে গেছে।

মনে রেখো

নাথ-সাহিত্যের একটা বিখ্যাত অংশ হলো ময়নামতীর কথা ও গোপীচন্দ্রর গান। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কথা ও গানটি প্রচলিত। এই গল্পটি বাংলা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিহার, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে।

নাথ-যোগী নামের এক ধর্ম সম্প্রদায় এই সময়ে বাংলায় ছিল। তাদের দেবতা শিব। এই নাথ-যোগীদের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়। তাকে বলে *নাথ সাহিত্য*। এই লেখাগুলিতে সন্ন্যাস-জীবন যাপনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

ভেবে বলোতো, কিভাবে সেই যুগে এই গল্পটি বাংলা থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে?

শ্রীচৈতন্যের জীবন এবং কাজ নিয়ে লেখালেখির ধারা এই সময়ে শুরু হয়। চৈতন্যের জীবনী নিয়ে কাব্য লেখেন অনেক বৈষ্ণব কবি। এগুলিকে *চৈতন্যজীবনীকাব্য* বলা হয়।

আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলমিশ ঘটিয়ে এই সময়ে লেখালেখির ধারা ছিল। সৈয়দ আলাওল এবং দৌলত কাজি সেই ধারার কবি। আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির চিতোর রাজ্য অভিযানের কথা আছে।

৭.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এক সময়ে অনেকেই ভাবতেন যে প্রাচীনকালই ছিল বিজ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টির 'সুবর্ণ যুগ'। তুলনায় মধ্যযুগ হলো ইতিহাসের এক 'অন্ধকার সময়'। তাদের মতে ঐ সময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতির চাকা প্রায় থেমে যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আর পাঁচটা সময়ের মতো মধ্যযুগেও ভারতবর্ষ এই সমস্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলো।

বিজ্ঞানে উন্নতির বহু তথ্য আমরা পাই অল বিরুনির *কিতাব-অল হিন্দ*-এ। ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই লেখার মধ্যে দিয়েই তামাম ইসলামি দুনিয়ায় তিনি ছড়িয়ে দেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা। ঠিক কেমন ছিল বিজ্ঞান নিয়ে তখনকার ভারতীয়দের ভাবনা?

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি ঘটে মধ্যযুগে। এর আরম্ভ সুলতানি আমল থেকে। দিল্লিতে একটা উঁচু মিনারের উপর ফিরোজ শাহ তুঘলক তৈরি করান একটা মানমন্দির। তার উপর বসানো হয় একটা সূর্যঘড়ি। এছাড়া খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে চৈনিক চৌম্বক কম্পাস এর ব্যবহার শুরু হয় ভারতের সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে।

মুঘল বাদশাহ আকবর ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের বিষয় খুবই আগ্রহী। তাঁর দরবারে অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়—যেমন জিনিসের দাম, জনসংখ্যা, ফুল-ফল, আবহাওয়া, খাজনার হার ইত্যাদির হিসাবপত্র সুষ্ঠুভাবে রাখা হতো। এছাড়া আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে, শিক্ষিত না হলেও আকবর নিজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ রাখতেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজও করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গির *তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি*-তে উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার বিষয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন জয়পুরের রাজা সওয়াই জয় সিংহ। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং বারাণসীতে মানমন্দির তৈরি করেন।

মধ্যযুগের ভারতে সুলতানি শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই আমদানি হয় গ্রিকো-আরবি ধারার ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের। উত্তর ভারত থেকে এই চিকিৎসাপদ্ধতি ক্রমশ অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসাও চালু ছিল সর্বত্র। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের মতো

কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের হাত ধরে ইউরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিও ভারতে আসে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে।

সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই সময়ে বড়ো রকমের বদল হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে বারুদ-ব্যবহারকারী আগ্নেয়াস্ত্র চিন থেকে মোঙ্গলদের হাত ঘুরে প্রথমে ভারতে এসে পৌঁছয়। এর কিছু পরে ভারতের কিছু অঞ্চলে শুরু হয় বারুদ-চালিত রকেটের ব্যবহার। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিন ও মামেলুক-শাসিত মিশর থেকে বন্দুকের প্রযুক্তি আসে ভারতে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পোর্তুগিজরা এই প্রযুক্তি দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে দেয়। এই সময়ের আশেপাশেই মুঘলরাও উত্তর ভারতে যুদ্ধে ব্যাপকহারে বন্দুক ও কামানের ব্যবহার চালু করে। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সময় ঘোড়ার দু-পাশে সৈনিকের পা রাখার জন্য পাদানির (রেকাব) ব্যবহার তুর্কি বাহিনীকে বাড়তি সুবিধা দিত। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং রণহস্তীর সঙ্গে এ দেশের রাজা-বাদশাহদের সৈন্যবাহিনীতে ক্রমশ কামান-চালক এবং বন্দুকধারী সৈন্যরা জায়গা করে নিতে থাকে।

ছবি ৭.২৮ : মুঘলদের রণথম্ভোর দুর্গ অভিযানের একটি ছবি। কামান পাহাড়ি পথে উপরে তোলার জন্য গবাদি পশুর ব্যবহার হতো।

ভারতীয়রা আদিকাল থেকে তালপাতায় কিংবা গাছের ছালে লিখত। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চিনে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে কাগজ তৈরি করার প্রযুক্তি চিন থেকে প্রথম নিয়ে আসে মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলরা। অল্প কিছু কালের মধ্যেই ভারতে কাগজের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লেখাপড়ার কাজ সহজ হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ভারতে কাগজ নাকি এতটাই সস্তা হয়ে ছিল যে, ময়রা মিষ্টি দেবার জন্য কাগজ ব্যবহার করতো। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাও করেন ইউরোপীয় মিশনারিরা। বাণিজ্যিক ভাবে এই প্রযুক্তির প্রচলনের জন্য অবশ্য আরো বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়।

মধ্যযুগের ভারতে বয়নপ্রযুক্তিতেও (কাপড় বোনা) নানা রকম বদল হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে পৌঁছয় তুলো বুনবার যন্ত্র 'চরখি'। এই সময় নাগাদই কাপড় বুনবার তাঁতেরও প্রচলন হয়। বিভিন্ন ছবিতে সন্ত কবীরকে তাঁত বুনতে দেখা যায়।

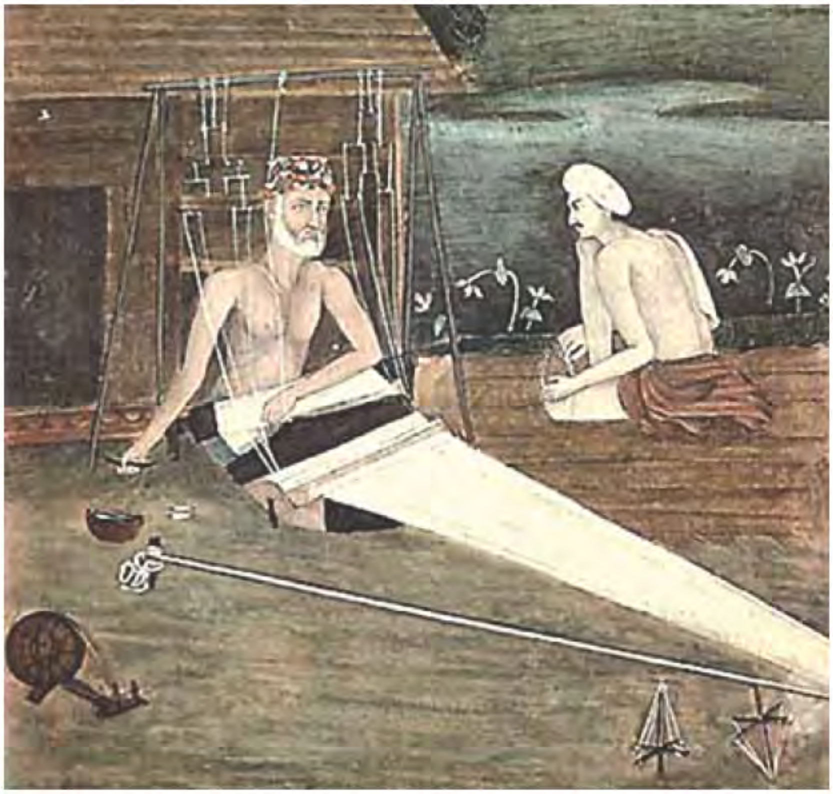

ছবি ৭.২৯:
সন্ত কবীর তাঁত বুনছেন।

এর কিছু পরে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে তুর্কিশাসকদের সঙ্গেই ভারতে আসে চরকা। ভারতে এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ইসামির *ফুতুহ-উস সালাতিন* বইতে। তুলো থেকে সুতো বোনবার এই প্রযুক্তি দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় ভারতে বস্ত্রশিল্প, বিশেষত কাপড় রঙ করার এবং ছাপার পদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত। নানা ধরনের কাপড় তৈরি হতো ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ভারতে 'ব্লক' ছাপাইয়ের আরম্ভ হয়। এই শিল্প ক্রমশ নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক নাগাদ ছিট (Chintz) ভারতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে ছাপা কাপড় রপ্তানিও করা হতো।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে ভারতে বিশেষত বাংলায়, রেশমশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুঁত গাছের গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করার প্রযুক্তি এদেশে আসে চিন থেকে। অনেকটা বারুদ ও কাগজের মতোই। এর পর আগামী দুশো বছর ধরে বাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজার অঞ্চল ছিল ভারতের গুটিপোকা চাষের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে দেশে-বিদেশে রেশম রপ্তানি করা হতো।

ছবি ৭.৩০: চাহার বাগ তৈরির কাজ তদারক করছেন বাদশাহ বাবর।

টুকরো কথা

চাহার বাগ

মুঘলরা খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে ভারতে নিয়ে আসে নতুন এক বাগান বানানোর কৌশল। ফারসিতে এর নাম *চাহার বাগ* (হিন্দিতে চার বাগ)। একটি বাগানকে জল দিয়ে চারটি সমান আয়তনের বর্গে ভাগ করা হতো। তারপর গোটা বাগানে নানরকম ফুলফলের গাছ লাগিয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। পারস্যে ও মধ্য-এশিয়া থেকে এই বাগান-রীতি মুঘলরা ভারতে নিয়ে আসে। মুঘল বাদশাহদের মধ্যে বাগান করার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ রাখতেন বাবর, জাহাঙ্গির ও শাহ জাহান। লাহোরের শালিমার বাগ, কাশ্মীরের নিসাত বাগ, দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি ও আগ্রাতে তাজ মহলে এই চাহার বাগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে উত্তর ভারতে মুঘলদের হাতে বাগিচাশিল্পের (বাগান তৈরি) ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই যে কলমপ্রথা চলে আসছিল, এই সময়ে এসে তার খুবই উন্নতি লক্ষ করা যায়। পোর্তুগিজদের হাত ধরে এই বিষয়ে কিছু ইউরোপীয় প্রযুক্তিও এই সময়ে ভারতে আসে। এই সব ঘটনার ফলে ভারতের ফলমূলের গুণগত মান এই সময়ে কিছুটা উন্নত হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক নাগাদ পারস্যদেশ থেকে ভারতে আসে বেল্ট এবং গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র (Persian Wheel)। ছোটো নাগরদোলার মতো দেখতে কাঠের তৈরি এই যন্ত্রের মাধ্যমে পশুশক্তির সাহায্যে কুয়ো বা খাল থেকে জল তোলা যেত। তবে যন্ত্রটি দামি হওয়ায় ভারতীয় কৃষকসমাজে এটি খুব বেশী জনপ্রিয় হয়নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে এটি ব্যবহার হতো।

কৃষিক্ষেত্রে মধ্যযুগের সবথেকে বড়ো উন্নতির দিক ছিল সেচব্যবস্থার প্রসার। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর শাসকরা এবং উত্তর ভারতে ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং মুঘল বাদশাহরা সেচ ব্যবস্থার খুব উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জমি পাথুরে এবং নদীর সংখ্যা তুলনায় কম হওয়ার ফলে সেচের কাজ করা ছিল কঠিন। এখানে বড়ো মাপের জলাধার খনন করে তার থেকে ছোটো নালা বা খালের মাধ্যমে চাষের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হতো। অন্যদিকে উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছোটো বড়ো নদীর সংখ্যা অনেক। এই নদীগুলি থেকে খালের মাধ্যমে জল সরাসরি পৌঁছে যেত চাষের জমিতে।

ছবি ৭.৩১ : একটি আধুনিক গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র।

মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি বিকাশের একটি বড়ো ক্ষেত্র ছিল ঘর-বাড়ি নির্মাণশিল্প। সুলতানদের বানানো শহরগুলিতে এর প্রমাণ আছে। বাঁকানো খিলান, গম্বুজ, চুনের ব্যবহার ইত্যাদি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মুঘল যুগেও এই ধারা বজায় ছিল। এই শিল্পে ভারতীয় কারিগর এবং তুর্কি স্থপতিরা মিলেমিশে ইন্দো-মুসলিম নির্মাণরীতির জন্ম দিয়েছিল।

মধ্যযুগের ভারতে অনেক নতুন প্রযুক্তিই এসেছিল চিন, পারস্য বা ইউরোপের মতো নানা অঞ্চল থেকে। ভারতীয় কারিগরেরা এইসব প্রযুক্তিকে আয়ত্তে আনে সহজেই। কখনওবা এগুলিতে সামান্য পরিবর্তন করে নিজেদের কাজের উপযোগী করে তোলে। তবে এই সময়ের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মৌলিক অবদান বিশেষ দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চায় জোয়ার আসে এবং তার ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমশ বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। তেমন কিছু আমরা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় লক্ষ করি না। এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে, ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং সামরিক প্রযুক্তিতে এই সময়ে ইউরোপে, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপে, দারুণ অগ্রগতি হয়েছিল। মূলত তারই সুবাদে ইউরোপের পক্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১. শূন্যস্থান পূরণ করো: **পূর্ণমান ১**

(ক) ____________ (টালি এবং ইঁট/সিমেন্ট এবং বালি/শ্বেতপাথর) ব্যবহার করে বাংলায় সুলতানি এবং মুঘল আমলে সাধারণ লোকের বাড়ি বানানো হতো।

(খ) কবীরের দুই পংক্তির কবিতাগুলিকে বলা হয় ____________ (ভজন/কথকথা/দোহা)।

(গ) সুফিরা গুরুকে মনে করত ____________ (পির/মুরিদ/বে-শরা)।

(ঘ) ____________ (কলকাতা/নবদ্বীপ/মুর্শিদাবাদ) ছিল চৈতন্য-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।

(ঙ) ____________ (নানক/কবীর/মীরাবাঈ) ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর সাধিকা।

(চ) দীন-ই ইলাহি-র বৈশিষ্ট্য ছিল মুঘল সম্রাট এবং তাঁর অভিজাতদের মধ্যে ____________ (গুরু-শিষ্যের/মালিক-শ্রমিকের/রাজা-প্রজার) সম্পর্ক।

(ছ) শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে কারুকার্য করাকে বলে ____________ (চাহার বাগ/পিয়েত্রা দুরা/টেরাকোটা)।

(জ) মহাভারতের ফারসি অনুবাদের নাম ____________ (হমজানামা/তুতিনামা/রজমনামা)।

(ঝ) (দসবন্ত/মির সঈদ আলি/আবদুস সামাদ) ____________ পরিচিত ছিলেন 'শিরিনকলম' নামে।

(ঞ) জৌনপুরি রাগ তৈরি করেন ____________ (বৈজু বাওরা/হোসেন শাহ শরকি/ইব্রাহিম শাহ শরকি)।

(ট) শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের লেখকের নাম ____________ (কাশীরাম দাস/কৃত্তিবাস ওঝা/মালাধর বসু)।

(ঠ) 'পারসিক চক্র' কাজে লাগানো হতো ____________ (জল তোলার জন্য/কামানের গোলা ছোড়ার জন্য/বাগান বানানোর জন্য)।

২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়? **পূর্ণমান ১**

(ক) বিবৃতি : নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি হতো।

ব্যাখ্যা-১ : নদীর ধারে শিল্প তৈরি করলে কর লাগতো না।

ব্যাখ্যা-২ : সেকালে সব মানুষই নদীর ধারে থাকতো।

ব্যাখ্যা-৩ : কাঁচা মাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধা হতো।

(খ) বিবৃতি : চৈতন্য বাংলা ভাষাকেই ভক্তি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-১: তিনি শুধু বাংলা ভাষাই জানতেন।

ব্যাখ্যা-২: সে কালের বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা।

ব্যাখ্যা-৩: ভক্তি বিষয়ক সব বই বাংলায় লেখা হয়েছিল।

(গ) **বিবৃতি :** চিশতি সুফিরা রাজনীতিতে যোগ দিতেন না।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে ঈশ্বর-সাধনা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা-২ : তাঁরা রাজনীতি বুঝতেন না।

ব্যাখ্যা-৩ : তাঁরা মানবদরদী ছিলেন।

(ঘ) **বিবৃতি:** আকবর দীন-ই ইলাহি প্রবর্তন করেন।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি অনুগত গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

(ঙ) **বিবৃতি :** মুঘল সম্রাটরা দুর্গ বানাতে আগ্রহী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-১ : দুর্গ বানানোর খরচ ছিল কম।

ব্যাখ্যা-২ : দুর্গ বানানো ছিল প্রাসাদ বানানোর চেয়ে সহজ।

ব্যাখ্যা-৩ : দুর্গ বানানোয় সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হতো।

(চ) **বিবৃতি :** জাহাঙ্গিরের আমলে ইউরোপীয় ছবির প্রভাব মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : এই সময়ে ইউরোপীয় ছবি মুঘল দরবারে আসতে শুরু করেছিল।

ব্যাখ্যা-২ : মুঘল শিল্পীরা সবাই ছিলেন ইউরোপীয়।

ব্যাখ্যা-৩ : ভারতীয় শিল্পীরা এই সময় ইউরোপ থেকে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন।

(ছ) **বিবৃতি :** মধ্য যুগের মণিপুরী নৃত্যে রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন প্রধান চরিত্র।

ব্যাখ্যা-১ : ভারতে নৃত্যের দেব-দেবী হলেন কৃষ্ণ এবং রাধা।

ব্যাখ্যা-২ : এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে বিস্তার লাভ করেছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : চৈতন্যদেব ছিলেন মণিপুরের লোক।

(জ) **বিবৃতি :** ভারতে প্রাচীন কালে তালপাতার উপরে লেখা হতো।

ব্যাখ্যা-১ : সে আমলে কাগজের ব্যবহার জানা ছিল না।

ব্যাখ্যা-২ : সে আমলে ভারতে কাগজের দাম খুব বেশি ছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : সে আমলে ভারতীয়রা কাগজের উপরে লেখার কালি আবিষ্কার করতে পারেনি।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৩**

(ক) সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতে কোন কোন ফল, সবজি এবং শস্যের চাষ সবচেয়ে বেশি হতো?

(খ) মধ্য যুগের ভারতে ভক্তি সাধক-সাধিকা কারা ছিলেন?

(গ) সিলসিলা কাকে বলে? চিশতি সুফিদের জীবনযাপন কেমন ছিল?

(ঘ) দীন-ই ইলাহি-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেমন ছিল?

(ঙ) স্থাপত্য হিসাবে আলাই দরওয়াজার বৈশিষ্ট্য কী?

(চ) ক্যালিগ্রাফি এবং মিনিয়েচার বলতে কী বোঝায়?

(ছ) শিবায়ন কী? এর থেকে বাংলার কৃষকের জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

(জ) কাগজ কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল? মধ্য যুগের ভারতে কাগজের ব্যবহার কেমন ছিল তা লেখো।

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :** **পূর্ণমান ৫**

(ক) মধ্য যুগের ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা লেখো।

(খ) কবীরের ভক্তি ভাবনায় কীভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এক হয়ে গিয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

(গ) বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলাফল কী হয়েছিল বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহি সম্বন্ধে একটি টীকা লেখো।

(ঙ) মুঘল সম্রাটদের আমলে বাগান তৈরি এবং দুর্গনির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

(চ) মধ্য যুগের বাংলার স্থাপত্যরীতির পর্যায়গুলির মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

(ছ) মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতিতে মুঘল বাদশাহদের কী ভূমিকা ছিল ?

(জ) মধ্য যুগের ভারতে কীভাবে ফারসি ভাষার ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা বেড়েছিল তা বিশ্লেষণ করো।

(ঝ) সুলতানি এবং মুঘল আমলে সামরিক এবং কৃষি প্রযুক্তিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) রাজনীতি, জীবনযাপন এবং ধর্ম নিয়ে একজন সুহরাবর্দি সুফি সাধকের সঙ্গে কবীরের কাল্পনিক সংলাপ লেখো।

(খ) মনে করো তুমি চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি দেখলে চৈতন্যদেব নগরসংকীর্তনে বেরিয়েছেন। তুমি কী করবে?

(গ) যদি তুমি মুঘল কারখানার একজন চিত্রশিল্পী হতে তা হলে বাদশাহের সুনজরে পড়ার জন্য তুমি কী কী ছবি আঁকতে?

(ঘ) ধরো তুমিই আজ তোমার শ্রেণির শিক্ষিকা/শিক্ষক। তুমি বাংলা ভাষায় আরবি এবং ফারসি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে পড়াচ্ছ। রোজকার বাংলা কথাবার্তায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি তালিকা তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে চাও। এমন একটি তালিকা তুমি তৈরি করো। দরকারে একটি বাংলা অভিধানের সাহায্য নাও।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

৮.১. গোড়ার কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট বুঝতে হলে কেন ঐ সংকট তৈরি হয়েছিল তা জানা দরকার। তার জন্য ঐ সময়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্য অনেক বড়ো হয়ে পড়েছিল এবং মনসব নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে মারাঠাদের মতো এক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এরা মুঘলদের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিন ধরে মুঘলরা নিজেদের যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই ধারণায় আঘাত করা হয়। এই অধ্যায়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির প্রতিরোধের কথাই আমরা পড়ব।

এই প্রতিরোধগুলির চরিত্র ছিল এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। মারাঠারা নিজেদের স্বরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। জাঠ এবং সৎনামি বিদ্রোহ মুঘল আমলে কৃষিব্যবস্থার সংকটের দিকটি তুলে ধরেছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতা এরা সকলেই চেয়েছিল। তবে এই আন্দোলনগুলিকে ধর্মীয় প্রতিরোধ বলা কিন্তু ঠিক নয়।

৮.২ শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

যুদ্ধপটু মারাঠাদের বাস ছিল পুণে এবং কোঙ্কণ অঞ্চলে। তারা অনেকেই বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডার রাজদরবারে উচ্চপদে ছিল। কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব রাজ্য ছিল না। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে শিবাজি মারাঠাদের জোটবদ্ধ করেছিলেন।

ছবি ৮.১ : বাঘ নখ

শিবাজির (জীবনকাল ১৬৩০-'৮০ খ্রিঃ) বাবা শাহজি ভোঁসলে বিজাপুরের সুলতানের জায়গিরদার ছিলেন। শিবাজি তাঁর মা জিজাবাঈ এবং শিক্ষক দাদাজি কোণ্ডদেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজি বিজাপুরের বেশ কিছু জমিদারকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। সুলতান শিবাজিকে দমন করতে আফজল খানকে পাঠান। আফজল খান শিবাজিকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সতর্ক শিবাজি উল্টে বাঘনখ নামের একটি অস্ত্র দিয়ে আফজল খানকেই হত্যা করেন। শিবাজির ক্ষমতাবৃদ্ধি

ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শিবাজি দু-বার বন্দরনগরী সুরাট আক্রমণ করে লুঠপাট করেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজিকে দমন করতে শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম এবং মির্জা রাজা জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিবাজিকে পুরন্ধরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী শিবাজি মুঘলদের ২৩টি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মনে রেখো, সে যুগে দুর্গ ছিল নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান স্তম্ভ। এরপর শিবাজি আগ্রার মুঘল দরবারে পৌঁছলে তাকে অপমান করা হয়। তাঁকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করা হয়। শিবাজি একটি ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে মুঘলদের সঙ্গে আবার শিবাজির দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড়োসড়ো প্রতিরোধ আন্দোলন। শিবাজি একটি সুপরিকল্পিত এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন। রায়গড়ে তাঁর অভিষেক হয় (১৬৭৪ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, অন্যান্য মারাঠা সর্দারদের থেকে তিনি যে আলাদা সেটাই প্রমাণিত হলো। তাঁর আট জন মন্ত্রীকে বলা হতো অষ্টপ্রধান। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পেশওয়া। মারাঠারা নিজেদের রাজ্যকে বলত স্বরাজ্য। স্বরাজ্যের বাইরে মারাঠা সেনারা আশপাশের মুঘল এলাকাগুলি আক্রমণ করে সেখান থেকে কর আদায় করত। যেসব সৈনিক মারাঠা রাজ্যে স্থায়ীভাবে চাকরি করত তাদের বলা হতো বর্গি। শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে।

টুকরো কথা

মাবলে ও পেশওয়া

শিবাজি এক সময় পুণের আশপাশের অঞ্চলগুলি আক্রমণ করছিলেন। তখন তিনি মাওয়াল অঞ্চল থেকে এক দল পদাতিক সেনা সংগ্রহ ও নিয়োগ করেন। এদের বলা হতো মাবলে বা মাওয়ালি। এরা তাঁর সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

শিবাজির মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে পেশওয়াদের হাতেই শাসন ক্ষমতা চলে আসে। তখন মুঘল শাসনের বড়োই দুর্দিন। শিবাজির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে পেশওয়া প্রথম বাজীরাও হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই হিন্দু রাজ্যের আদর্শকে বলা হয় হিন্দুপাদপাদশাহি। অর্থাৎ তিনি চাইলেন ধর্মের নামে মুঘলদের বিরুদ্ধে অন্য রাজাদের জোটবন্ধ করতে।

মানচিত্র ৮.১ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

শিখ শক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের আমলে মুঘলদের সংঘাত হয়। এই সংঘাতের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। শিখরা তাদের গুরুর প্রতি অনুগত ছিল। তাই নিয়ে অনেক সময় মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে শিখদের সংঘাত বেঁধে যেত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকে চতুর্থ গুরু রামদাসের ছেলে অর্জুনদেব শিখদের গুরু হন। এই সময় থেকেই শুরু হলো বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন করা। গুরু অর্জুনের ছেলে গুরু হরগোবিন্দ একসঙ্গে দুটি তলওয়ার নিতেন। তিনি বোঝাতে চাইতেন যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর আছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছ, শিখদের উত্থান অনেকটাই একটা স্বাধীন শক্তির উত্থানের মতোই হয়ে

উঠেছিল। মুঘল সরকারের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু শুধু ধর্মীয় কারণেই মুঘল-শিখ সংঘাত হয়নি। এ কথাও প্রচলিত যে তেগবাহাদুর এক পাঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। তেগবাহাদুরকে বন্দী করে মুঘলরা হত্যা করে। এই ঘটনার পর শিখরা পাঞ্জাবের পাহাড়ি এলাকায় চলে যায় এবং সেখানেই দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

টুকরো কথা

খালসা

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা নামক একটি সংগঠন তৈরি করেন। খালসার কাজ ছিল শিখদের নিরাপদে রাখা। সামরিক প্রশিক্ষণ শিখদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের 'পন্থ' বা পথ ঠিক করে দেন। গুরু তাদের পাঁচটি জিনিস সবসময় কাছে রাখতে বলেন। এই পাঁচটি জিনিসের নামই 'ক' অক্ষর দিয়ে শুরু। এগুলি হলো—কেশ, কঙ্ঘা (চিরুনি), কচ্ছা, কৃপাণ এবং কড়া। এছাড়াও খালসাপন্থী শিখরা 'সিংহ' পদবি ব্যবহার করতে শুরু করল। পাহাড়ি হিন্দু রাজাদের সঙ্গে শিখদের মাঝে মধ্যেই ছোটোখাটো যুদ্ধ চলত। শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হিন্দু রাজারা মুঘল সরকারের সাহায্য চেয়েছিল। মুঘলদের পক্ষেও শিখ সামরিক শক্তির উত্থান মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের সংঘাতের চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বান্দা বাহাদুর লড়াই চালিয়ে যান।

গুরু গোবিন্দ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শিখ ধর্মীয় আন্দোলন মানুষের মধ্যে সমতার কথা বলত। তবে অনেক সময় সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে এটি একটি প্রতিরোধী আন্দোলন হিসাবে রাজনৈতিক রূপ নিত।

অন্যান্য কয়েকটি বিদ্রোহ

দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলের জাঠরা ছিল প্রধানত কৃষক। তাদের মধ্যে অনেকে আবার জমিদারও ছিল। রাজস্ব দেওয়া নিয়ে জাহাঙ্গির ও শাহ জাহানের আমলে তাদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত হতো। ঔরঙ্গজেবের আমলে তারা স্থানীয় এক জমিদারের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। জাঠরা একটি পৃথক

রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিল। মুঘলদের বিরুদ্ধে জাঠ প্রতিরোধ ছিল একদিকে কৃষক বিদ্রোহ অন্যদিকে একটি আলাদা গোষ্ঠীপরিচয়ে জাঠরা একজোট হচ্ছিল। মথুরার কাছে নারনৌল অঞ্চলে এক দল কৃষক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। এরা ছিল সৎনামি নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি আসলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন। তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে কৃষি সংকটও বেড়ে গিয়েছিল। সেটিও ছিল এই বিদ্রোহগুলির একটি কারণ।

ভেবে বলোতো কৃষি সংকট বলতে কী বোঝায়?

৮.৩ জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট : কারণ ও প্রভাব

শাহ জাহানের সময় থেকেই মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মনসবদারদের তাদের পদ অনুযায়ী যা বেতন পাওয়ার কথা, তা দেওয়া যেত না। অনেক সময় আবার কৃষক বিদ্রোহের কারণে রাজস্ব আদায় করা যেত না। এছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সবসময় সম্ভব হচ্ছিল না। মনসবদারেরা বেতন না পেলে তাদের যতজন ঘোড়সওয়ারের দেখাশোনা করার কথা, ততজনের দেখাশোনা করা যেত না। অর্থাৎ খাতায় কলমে হিসাবের সঙ্গে আসলে যা হচ্ছে, তার তফাত বেড়েই চলেছিল। ঔরঙ্গজেবের সময় এই সমস্যা আরও বেড়েছিল।

জায়গিরদারি এবং মনসবদারি সংকটের সঙ্গে যুক্ত সে যুগের কৃষিসংকট। এই সময় ফসলের উৎপাদন বেড়েছিল। কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য মুঘল মনসবদাররা মারাঠা সর্দারদের সাহায্যও নিত। তার মানে ঐ সব অঞ্চলে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে আবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে অভিজাতরা চাইলেন জমি থেকে তাদের আয় আরও বাড়াতে। তারা জমিদার এবং কৃষকদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। কৃষকরাও বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। অনেক সময় জমিদাররাও তাদের মদত দিত।

টুকরো কথা

মুঘল দরবারে দলাদলি

সপ্তদশ শতকের শেষে মনসবদারদের মধ্যে ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র ও লড়াই শুরু হলো। দরবারি রাজনীতিতে ইরানি, তুরানি, মারাঠা, রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত শুরু হলো। মনসবদারি এবং জায়গিরদারি সংকটের জন্য কোনো একজন মুঘল শাসক দায়ী ছিলেন না। অনেকদিন ধরে নানা সমস্যা জট পাকিয়ে ওই সংকট তৈরি করেছিল।

কোনো কোনো সময়ে কৃষকরা রাজস্ব না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। তখন তাদের জমিতে চাষ হতো না। চাষ না হলে রাজস্ব আদায় করা যাবে না। তাই যে সব মনসবদার এই সব জমিতে জায়গির পেত, তারাও ভালোভাবে ঘোড়সওয়ারের ভরণপোষণ করতে পারত না।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডা জয়ের পর দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চল মুঘলদের হাতে এসেছিল। ঐ অঞ্চলের সব থেকে ভাল জমিগুলি

বলো তো ভালো জমিগুলি কেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব খাস জমি করে রেখেছিলেন?

ঔরঙ্গজেব খাস জমি বা খালিসা হিসাবে রেখেছিলেন। সেগুলি জায়গির হিসাবে দেওয়া হতো না। খাস জমির রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হতো। সুতরাং, জমির অভাব ছিল না তবে জায়গির হিসাবে দেওয়া যায়, এরকম ভালো জমির পরিমাণ কমে গিয়েছিল। মুঘল শাসকেরা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াতে পারেন নি। ফলে এই সমস্যা আরো গভীর হয়েছিল।

টুকরো কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের চরিত্র

মুঘল সাম্রাজ্য কতটা শক্তিশালী ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক আছে। এক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে মুঘলরা ছিল দারুণ বলশালী। তাদের তৈরি করা সাম্রাজ্যের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বীজ। আসমুদ্রহিমাচলে ছড়িয়ে ছিল মুঘলশক্তির ক্ষমতা। আরেক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে মোটেও মুঘলরা এতটা ক্ষমতা রাখত না। তাঁদের একজনের মতে মুঘল সাম্রাজ্যকে এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিশ্ছিদ্র গালিচার সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। বরং মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দেওয়া একটা কম্বল হিসেবেই ভাবা ঠিক হবে। উত্তর ভারতে মুঘলদের আধিপত্য থাকলেও অন্যান্য অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

ছবি ৮.২ : মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খানের শিবিরে শিবাজির অতর্কিত হামলার দৃশ্য। জানলা দিয়ে পালানোর সময় শায়েস্তা খানের হাতের আঙুল শিবাজির তলওয়ারের কোপে কাটা যায়। ঘটনার স্থান পুণে, সময় ১৬৬৩ খ্রিঃ।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১. নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও: **পূর্ণমান ১**

(ক) পুণে, কোঙ্কণ, আগ্রা, বিজাপুর।

(খ) বান্দা বাহাদুর, আফজল খান, শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম।

(গ) অষ্ট প্রধান, বর্গি, মাবলে, খালসা।

(ঘ) রামদাস, তেগবাহাদুর, জয়সিংহ, হরগোবিন্দ।

(ঙ) কেশ, কৃপাণ, কলম, কঙ্ঘা।

২. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো: **পূর্ণমান ১**

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
রায়গড়	নারনৌল
হিন্দুপাদপাদশাহি	শিবাজি
গোলকোন্ডা	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
সৎনামি	প্রথম বাজীরাও
পাঠান উপজাতি	দাক্ষিণাত্য

৩. সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও: **পূর্ণমান ৩**

(ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে কী কী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল?

(খ) কবে, কাদের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি হয়েছিল? এই সন্ধির ফল কী হয়েছিল?

(গ) জাঠদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত কেন বেঁধেছিল?

(ঘ) শিবাজির সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল?

(ঙ) বিজাপুর ও গোলকোন্ডা জয়ের ফলে মুঘলদের কী সুবিধা হয়েছিল?

৪. বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও: **পূর্ণমান ৫**

(ক) মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখরা কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করেছিল?

(খ) মুঘল যুগের শেষ দিকে কৃষি সংকট কেন বেড়ে গিয়েছিল? এই কৃষি সংকটের ফল কী হয়েছিল?

(গ) মুঘল যুগের শেষ দিকে জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থায় কেন সংকট তৈরি হয়েছিল? মুঘল সাম্রাজ্যের উপর এই সংকটের কী প্রভাব পড়েছিল?

(ঘ) সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে তোমার মতামত কী?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) ধরো তুমি একজন মারাঠা সর্দার। তোমার সঙ্গে একজন জাঠ কৃষকের দেখা হয়েছে। মুঘল শাসনের নানা দিক নিয়ে ঐ জাঠ কৃষকের সঙ্গে তোমার একটি কথোপকথন লেখো।

(খ) ধরো তুমি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারের একজন ঐতিহাসিক। তুমি মারাঠা, শিখ, জাঠ ও সৎনামিদের লড়াইয়ের ইতিহাস লিখছো। কীভাবে তুমি তোমার লেখায় এই লড়াইগুলির ব্যাখ্যা করবে?

(গ) ধরো তুমি একজন অভিজাত জায়গিরদার। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তোমার সঙ্গে তোমার জমির কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে একটি সংলাপ লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

নবম অধ্যায়

আজকের ভারত

সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন

এতক্ষণ যা যা পড়া হলো, সেসব ছিল পুরোনো দিনের কথা। কিন্তু, সেই পুরোনো অনেক কিছুর ছাপ এখনও আমাদের উপরে পড়ে। পুরানো দিনের অনেক শব্দ এখনও আমরা ব্যবহার করি। পুরোনো দিনের অনেক ধারণা এখনও আমাদের চারপাশে রয়েছে। শুধু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধারণাগুলি আরও বদলেছে মাত্র। তবে তার ভেতরের মূলকথাটা অনেক ক্ষেত্রে একই রয়ে গেছে।

তেমনই একটা ধারণা 'সরকার'। সরকার শব্দটা ফারসি থেকে এসেছে। মধ্যযুগে ভারতে এই শব্দটির মানে শাসনকর্তা বা শাসনব্যবস্থা—দুই হতো। এই সরকার শব্দটা আজও আমরা ব্যবহার করি। ইংরেজিতে এর সমান শব্দ হলো Government (গভর্নমেন্ট)। Govern মানে শাসন করা।

আমরা যে দেশে এখন বাস করি, সেই ভারতেও একটা সরকার আছে। সব স্বাধীন দেশেই সরকার থাকে। আগে ক্ষমতার জোরে যুদ্ধে জিততেন যিনি, তিনিই শাসন করতেন। এখন দেশের লোকেরা নিজেরা ঠিক করেন কে বা কারা দেশশাসন করবে। নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নেওয়ার এই পদ্ধতিকেই বলে 'গণতন্ত্র'। 'তন্ত্র' মানে ব্যবস্থা। লোকজন বা জনগণ নিজেরাই দেশের তন্ত্র বা ব্যবস্থা ঠিক করেন বলেই এটা গণতন্ত্র। এইভাবে জনগণ যাদের বেছে নেন দেশ চালাবার জন্য, তারা মিলেই হয় সরকার।

বলোতো অনেক আগে বাংলায় একবার প্রজারাই তাদের রাজাকে বেছে নিয়েছিলেন। কে সেই রাজা? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

মনে রেখো

এর আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা রাজা, সুলতান, বাদশাহের কথা পড়েছি। তাদের শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। এখনও কোনো কোনো দেশে রাজা-রানি আছেন। যেমন ইংল্যান্ড, জাপান। তবে সেসব দেশেও গণতান্ত্রিক সরকার আছে। জনগণ সেখানে নিজেরাই সরকার বেছে নেন। ভারতে রাজা-রানি নেই। এখানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আছেন।

প্রত্যেক দেশ কীভাবে চলবে তার নিয়মকানুন আছে। এই নিয়মকানুনকেই 'সংবিধান' বলা হয়। 'বিধান' শব্দটার মানেই নিয়ম। বেশিরভাগ দেশেরই সংবিধান আছে লিখিত আকারে। আবার কোনো কোনো দেশে তা লেখা নেই। সেখানে বহু বছর ধরে চলে আসা নিয়মগুলোই মেনে নেওয়া হয়।

ছবি ৯.১ :

ড. বি. আর. আম্বেদকর
জন্ম : ১৮৯১খ্রিঃ
মৃত্যু : ১৯৫৬খ্রিঃ

ভারতের একটি লিখিত সংবিধান আছে। ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সংবিধান। এত ধারা-উপধারা আর কোনো দেশের সংবিধানে নেই। এই সংবিধানের প্রধান রূপকার ড. বি. আর. আম্বেদকর। ভারতীয় সংবিধানে দেশের সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের অধিকারকেই স্বীকার করা আছে। সেই অধিকার মেনেই প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে দেশে একবার নির্বাচন হয়। যাকে চলতি কথায় 'ভোট হওয়া' বলে। সেই নির্বাচনে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকার বেছে নেন।

টুকরো কথা

ভারতের সংবিধান

প্রায় তিন বছর আলোচনা-বির্তকের পরে ভারতের সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ঐ সংবিধান কার্যকর হয়। ২৬ জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' পালন করা হয়।

ভারত একটা বিশাল দেশ। এই দেশে একটাই কেন্দ্রীয় সরকার আছে। আবার প্রতিটা রাজ্যের নিজস্ব সরকার আছে। তাদের বলা হয় রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুটোই জনগণ বেছে নেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচন করেন দেশের সমস্ত জনগণ। রাজ্য সরকারকে নির্বাচন করেন ঐ রাজ্যের বাসিন্দারা।

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দুয়েরই কী কী ক্ষমতা, তা বলা আছে। যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-রকম সরকারের ক্ষমতাই স্বীকার করা হয়, তাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। ফলে, ভারতের সরকার একদিকে গণতান্ত্রিক— কারণ জনগণ নিজেরা শাসক বেছে নেন। আবার অন্যদিকে তা যুক্তরাষ্ট্রীয়— কারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-ধরনের সরকারই এই শাসনব্যবস্থায় আছে।

'সরকার' ধারণাটি তার কাজের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে, সরকারের কাজ কী— এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। খুব সাধারণভাবে বললে, সরকারের কাজ হলো দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। জনগণের যাতে ভালো হয় তার জন্য নানান উদ্যোগ নেওয়া, কর সংগ্রহ করা, দেশের স্বাধীনতা বজায়, রাখা। দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য সরকার কাজ করবে। আর এইসব কাজে সরকারকে পথ দেখাবে সংবিধান। সংবিধান মেনেই সরকার দেশ শাসন করবে।

সরকারের কাজকর্মকে চালানোর জন্য তিনটি বিভাগ করা হয়েছে। আইন বিভাগ,যেখানে দেশ পরিচালনার আইন তৈরি হবে। শাসন বিভাগ, ঐ আইন অনুসারে যারা দেশ পরিচালনা করবে। বিচার বিভাগ, সংবিধান অনুসারে দেশ

ছবি ৯.২ : নতুন দিল্লিতে অবস্থিত ভারতের সংসদ ভবন।

শাসন হচ্ছে কিনা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কিনা—এসবের প্রতি নজর রাখবে। আর কেউ নিয়ম ভাঙলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও বিচার বিভাগের কাজ।

টুকরো কথা

সরকারের বিভাগ

সব দেশেই বিচার বিভাগকে বাকি দুটি বিভাগের (আইন ও শাসন) থেকে আলাদা রাখা হয়। কোনোভাবেই যাতে সুবিচারের পথ বন্ধ না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এককথায় একে বলে 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি'। 'স্বতন্ত্রীকরণ' মানে আলাদা করা। গণতন্ত্র যাতে বলবৎ থাকে, তার জন্যই এই নীতি নেওয়া হয়। ফ্রান্সের দার্শনিক মন্তেস্কু প্রথম এই নীতির কথা বলেন।

ভারতের জনগণ শুধু শাসক নির্বাচন করেন না, নিজেরাও শাসনে অংশ নেন। সরাসরি শাসনে অংশ নেওয়াকেই বলে 'স্বায়ত্তশাসন'। 'স্ব' মানে নিজের আর 'আয়ত্ত' মানে অধীন। জনগণ যেখানে নিজেই নিজের অধীন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলে 'স্বায়ত্তশাসন'। পশ্চিমবঙ্গে এই স্বায়ত্তশাসন দু-ভাবে দেখা যায়। শহর বা নগরের ক্ষেত্রে পৌরসভা, আর গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত।

ছোটো ছোটো শহরে বা নগরে পৌরসভা আছে। 'পৌর' কথাটা এসেছে 'পুর' থেকে। সংস্কৃতে পুর মানে নগর। ঐ শহর বা নগরের আঠারো বছর বা তার বেশি বয়সের বাসিন্দারা ভোট দিয়ে পৌরসভার সদস্যদের বেছে নেন। এঁদের পৌরপ্রতিনিধি বলে। এঁদের মধ্যে একজন পৌরপ্রধান হন। শহর বা

বলোতো, বর্তমানে ভারতের সরকার যদি হয় গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, তাহলে সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতের সরকার কেমন ছিল?

নগরের জনসেবা, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও প্রশাসন এগুলির দেখভাল করাই পৌরসভার কাজ। পানীয় জল সরবরাহ করা, রাস্তাঘাট বানানো, দূষণ রোধ করা, এসবই পৌরসভাগুলি করে থাকে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি বানিয়ে শিক্ষার প্রসারে ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে পৌরসভাগুলি উদ্যোগ নেয়।

শহর বা নগরে পৌরসভার মতোই গ্রামে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের বসিন্দারা ভোট দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচন করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন হন পঞ্চায়েত প্রধান। গ্রামের সবরকম উন্নতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। পানীয় জলের সরবরাহ, গ্রামের পরিচ্ছন্নতা, পথ-ঘাট নির্মাণ এসবই গ্রাম পঞ্চায়েত করে। আবার শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় করা, চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা, বনসৃজন করা— এসবও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে পড়ে।

অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে একটা 'ব্লক' হয়। সেই ব্লকে একইভাবে একটা পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। আবার কয়েকটি ব্লক নিয়ে হয় 'জেলা'। জেলায় থাকে জেলাপরিষদ। গ্রামের মতোই ব্লক ও জেলার স্বায়ত্তশাসনের ভার থাকে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের উপরে।

পৌরসভা হোক বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা—সবেতেই পাঁচ বছর অন্তর জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। আবার এই দুই ক্ষেত্রেই নানাভাবে জনগণ নিজেরাও শাসনব্যবস্থা ও নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এভাবেই জনগণের সরাসরি যোগদানের মধ্যে দিয়েই শহর বা নগর ও গ্রামের গণতন্ত্র জোরদার হয়ে ওঠে।

তুমি পৌরসভা এলাকায় থাকো না পঞ্চায়েত এলাকায় থাকো? তোমার এলাকায় কি বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে? কতগুলি খেলার মাঠ বা পার্ক আছে? কীভাবে তোমরা পানীয়জল পাও? বন্ধুরা সবাই মিলে এসবের খোঁজ নিয়ে নাও।

টুকরো কথা

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র ব্যাপারটা কিন্তু নতুন ধারণা নয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা। গ্রিস দেশে এথেন্সের লোকেরা তাদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নিত। শোনা যায় যে, লোকেরা ভাঙা কলসির টুকরোর উপর পছন্দমতো চিহ্ন এঁকে আরেকটা আস্ত কলসির মধ্যে ফেলে দিত। যার পক্ষে বেশি কলসির টুকরো জমা পড়ত, সেই হতো শাসক।

একটা পৃথিবীর মানচিত্র নাও। এবার তার মধ্যে থেকে গ্রিস ও এথেন্স খুঁজে বের করো।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো : **পূর্ণমান ১**

(ক) (বাংলাদেশ/জাপান/ফ্রান্স) ______________ এ এখনও রাজা-রানি আছেন।

(খ) নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিকে বলে ______________ (গণতন্ত্র/রাজতন্ত্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(গ) (ভারতের/জাপানের/ইংল্যান্ডের) ______________ সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান।

(ঘ) জনগণ যে শাসনব্যবস্থায় নিজেই নিজের অধীন, তাকে বলে ______________ (সংবিধান/সভা ও সমিতি/স্বায়ত্তশাসন)।

(ঙ) অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হয় একটা ______________ (ব্লক/জেলা/পৌরসভা)।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো : **পূর্ণমান ১**

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
সরকার	গ্রিস
ড. বি.আর. আম্বেদকর	স্বায়ত্তশাসন
যুক্তরাষ্ট্র	ভারতীয় সংবিধান
এথেন্স	ফারসি
জেলাপরিষদ	ভারত

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৩**

(ক) বর্তমান ভারতে শাসন ব্যবস্থার কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

(খ) যুক্তরাষ্ট্র ও সংবিধান কাকে বলে?

(গ) সরকারের কাজ কী কী?

(ঘ) স্বায়ত্তশাসন বলতে তুমি কী বোঝো?

(ঙ) নির্বাচনকে সাধারণ ভাবে কী বলে? ভারতে কত বছর অন্তর সরকার নির্বাচন হয়? সরকার নির্বাচনের সঙ্গে গণতন্ত্রের কী সম্পর্ক?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও : **পূর্ণমান ৫**

(ক) ভারতকে কেন গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয়? দেশ পরিচালনায় সংবিধানের ভূমিকা কী বলে তুমি মনে করো?

(খ) সরকারের কয়টি ভাগ? ঐ ভাগগুলি কোনটি কী কাজ করে? বিচার বিভাগকে কেন আলাদা করে রাখা হয়?

(গ) পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কী কী কাজ করে?

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিষয়ে একটি টীকা লেখো।

(ঙ) প্রাচীন কালে ভারতে ও অন্য কোথাও গণতন্ত্রের কথা জানা যায় কী? সেই গণতন্ত্র কেমন ছিল বলে তুমি মনে করো?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) ধরো তুমি একজন পৌর-প্রতিনিধি/পঞ্চায়েত সদস্য। তোমার স্থানীয় অঞ্চলের উন্নতি করার জন্য তুমি কী কী কাজ করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বক্তৃতা পেশ কর।

(খ) ধরো তুমি ভারতের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি তোমার অঞ্চলের উন্নতি করতে চাও। কী কী ভাবে তুমি সেই উন্নতির পরিকল্পনা করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বিতর্কের আয়োজন কর।

(গ) ধরো পাল যুগের বাংলার একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে তোমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছে। তোমরা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এসব নিয়ে গল্প করছো। তোমাদের সেই কথাবার্তা নিয়ে সংলাপ লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির সপ্তম শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের জন্য *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- বিগত ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার (ন্যাশানাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫) নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয় প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষের মধ্য যুগের ইতিহাসের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত মনে রেখে এই বইতে বাংলার ইতিহাসের ওপর আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (বিশেষত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে)।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। যেমন পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অধ্যায়গুলি একসঙ্গে পড়া যেতে পারে।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ১০০টি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ১১, ১৩, ১৫, ৩৯, ৫০, ৭৩, ৮৪, ৮৬, ১১৮, ১১৯ এবং ১৬২ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- প্রতি পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। তাদের ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে। যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ে দিল্লি সুলতানির সম্প্রসারণের কোনো ধারাবিবরণী না দিয়ে কেবল একটি মানচিত্রে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুটি রেখচিত্রের সাহায্যে মধ্যযুগের ভারতের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কথা এবং ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানির আমদানি-রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- এই বইটির একটি বড়ো সম্পদ এর ছবিগুলি। ছবিকে সব সময়েই ধারাবিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়, এগুলি মূল ধারাবিবরণীরই অঙ্গ।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার সাল-তারিখ। এই বইতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-বাদশাহের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণ ভাবে শাসক বংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী— 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো' দেওয়া আছে, যার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। প্রত্যেক অনুশীলনীতে 'কল্পনা করে লেখো' অংশে কয়েকটি কাল্পনিক প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশক্তিকে পরখ করা। তবে মূল্যায়নের সময় এই অংশের প্রশ্নগুলি রাখা যাবে না।

- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না।** ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ে সেই রকম একটি দিকনির্দেশ করা হয়েছে।